তারাপীঠের একতারা



তারাপীঠের একতারা

চিত্তরঞ্জন দেব

প্রজ্ঞা প্রকাশনী
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
দোল পূর্ণিমা
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৬৬

প্রকাশক
সুকমলকান্তি ঘোষ
প্রজ্ঞা প্রকাশনী
১২।১, লিণ্ডসে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১৬

একমাত্র পরিবেশক
পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা—১৬

মুদ্রাকর
শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য
কো-অপারেটিক প্রেস
১, ছিদাম মুদি লেন
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট
মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়
ব্লক ও মুদ্রণ : কলার স্টুডিও

দাম : তিন টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা

চিত্তরঞ্জন দেব (১৯২৭) অল্প বয়স থেকেই কবিতা প্রবন্ধ এবং গল্প লিখছেন। ১৯৪৪ সাল থেকে ইনি বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-সদনের একজন দায়িত্ব-সম্পন্ন কর্মীরূপে নিযুক্ত আছেন। প্রধান প্রধান বাংলা ও ইংরাজী সাময়িক পত্রের নিয়মিত লেখকরূপে সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৫৩ সালের আন্তর্জাতিক গল্প প্রতিযোগিতায় চিত্তরঞ্জন দেবের গল্প বাংলাতে শীর্ষস্থান অধিকার করে এবং গল্পটি ভারতের ও বিদেশের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। বাংলার লোকগীতি বিশেষজ্ঞ ও সংগ্রাহক হিসাবে এঁর পরিচয় রয়েছে 'লালন গীতিকা' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং 'বাংলার ব্রাউল ও বাউল গান' নামক বই দু'খানির মধ্যে। লোকশিল্প সমালোচনার জন্য ইনি সম্প্রতি বাংলার অন্যতম প্রতিনিধিরূপে অখিল ভারত লোকসংস্কৃতির এলাহাবাদ ও বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দেব বহু তীর্থ পর্যটন করেছেন। বর্তমান বইটি পল্লীবাংলার তীর্থাবগাহনের একটি অধ্যায়।

উৎসর্গ

মা-কে প্রণাম

এক

রামপুরহাট স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল। আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। কিন্তু কোন্‌দিকে যেতে হবে? ব্রহ্মচারীকে বলি, "কাউকে শুধিয়ে নাওনা তারাপীঠের পথটা!"

"তারাপীঠ তারাপীঠ করোনা যখন তখন। গন্তব্যের নাম প্রথমেই করতে নেই।"

"তা হলে?"

"আগে চলো যাই কানাইবাবুর কাছে।"

"বেশ তো ভাল কথা। ভদ্রলোক অত করে বলেছিলেন—যদি যাওয়া ঘটে কখনও ওদিকে তাহলে পায়ের ধুলো দেবেন!"

"শুধু ধুলো দিতে যাবোনা। এই সকালবেলা ডানহাতের ব্যাপারটাও কিছুটা সেরে নিতে হবে কানাইবাবুর ওখানে।"

"ঠিক বলেছ। শুনেছি তারাপীঠে পৌঁছতে হলে হাঁটতে হয় অনেক পথ। এঞ্জিনে জল কয়লা তার আগে নিয়ে নিতে হবে।"

"তার আগে কানাইবাবুকে তো পেয়ে নিই—দেখি!"

পথের দু ধারে বাড়িঘর। মাঝখান দিয়ে আমরা চলেছি। এটা কি রামপুরহাট শহর? কিছুই জানিনে এখানকার খবর। শুনেছিলাম কানাইবাবু আছেন রামপুরহাট কোর্টে—এস. ডি. ও.র পেশকার।

কোর্টে যাঁদের আনাগোনা তাঁরাই চিনবেন কানাইবাবুকে। বলে দিতে পারবেন তাঁর বাসাটা কোনখানে। কিন্তু এখন বাজে কটা? কোর্ট কখন বসে? যদি এর মধ্যে কানাইবাবু কোর্টে চলে গিয়ে থাকেন?

সঙ্গী আরেকজন বলে, "ক্ষেপেছিস্, এখনও সাতটাই বাজেনি।"

"কোথায় হঠাৎ ঘড়ি দেখলে হে?"

"ঘড়ি আবার লাগে কিসে? সূর্যের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এটা ত আর বিলেত নয়।"

"একেবারে যে সূর্যসিদ্ধান্ত ঠাকুর!"

লোক ত কত চলেছে পথে—ডানে বাঁয়ে সামনে পিছনে, কিন্তু কেমন করে বুঝবো কে কোর্টের যাত্রী আর কে নয়? তা ছাড়া কোর্ট কোনদিকে—কোন্ পথে যেতে হয়, কিছুই তো জানিনে।

পথের উপরেই। বেশ একটা ফাঁকা জায়গায় এসে থামি। বাঁ দিকে একটা ডাল বেরিয়ে গেছে—কুচি কুচি কালো পাথর ছড়ানো তাতে। এর শেষে সুন্দর সাজানো গোছানো বাংলোমতো একখানি বাড়ি। কোনো বড়কর্তার অফিস, না কি হাসপাতাল?

কাছে কাকপক্ষীটি নেই যে কথার উত্তর দেবে।

দাঁড়ালাম একটা টিউবওয়েল দেখতে পেয়ে। জলটা বেশ ঠাণ্ডা। হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। অঞ্জলি ভরে খানিকটা জল পানও করলাম। গামছায় মুছে নিলাম হাতমুখ। মনে মনে খুঁজে চললাম কোনো পথিককে—যিনি বলে দিতে পারবেন আমাদের পথের সন্ধান।

এক বৈষ্ণব এলেন। বুঝি তৃষ্ণা পেয়েছে তাঁর। ঝোলাঝুলি নামিয়ে রেখে বসে পড়লেন কাছেই একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে। গায়ে নামাবলী। মাথায় টিকি। গলায় তুলসীর মালা। আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ভাবখানা, আমরা ছাড়লেই তিনি উঠে এসে টিপতে শুরু করবেন টিউবওয়েলের হাতল।

ওকে শুধালাম, "আচ্ছা বাবাজী, কানাইবাবু কোথায় থাকেন, জানেন কি?"

একটু অবাক হয়ে তিনি তাকালেন আমাদের দিকে। বললেন

ধীরে ধীরে, "কানাইবাবুর খবর জানিনে, কিন্তু কানাইকে আমিও খুঁজি মনে মনে। বলেই তিনি হাত ঢোকালেন তাঁর ঝুলির মধ্যে। একজোড়া মন্দিরা তুলে নিয়ে ঠুন্ ঠুন্ করে বাজাতে লাগলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরলেন,

কৃষ্ণ নাম লহ মুখে
লহ মনে প্রাণে
গোষ্ঠে আছেন কেষ্ট ঠাকুর
কৃষ্ণদাস বাখানে······"

সঙ্গী বললে, "তুমিও যেমন—স্বপ্নবিলাসীকে শুধিয়েছ বাস্তব সংসারীর খবর।"

বৈষ্ণবের গান তখনও থামেনি। মন্দিরাও বাজছে—ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্ আর তার সঙ্গে সঙ্গে গান শোনা যাচ্ছে,

"শোনো—মন দিয়া মন দিয়া
কৃষ্ণদাস যা বলে
শোনো—মন দিয়া মন দিয়া······"

বৈষ্ণবের গান আর না শুনে আমরা এগিয়ে চলি আবার। ছাতা মাথায়, ধুতিপাঞ্জাবি পরনে, বাটার চটি পায়ে একজন যাচ্ছেন। তাঁকে শুধাই, "কানাইবাবুর বাসাটা কোন্‌দিকে বলতে পারেন?"

একটুখানি থমকে দাঁড়িয়ে আরেকটু ভেবে নিয়ে তিনি বলেন, "পিছনে ছেড়ে এলেন যে! ফিরে যান আবার স্টেশনের দিকে। কাছাকাছি গিয়ে শুধোবেন অন্য কাউকে—ঠি-ই-ক দেখিয়ে দেবে!"

ফিরে তো যাবো ঐ দিকে, কিন্তু কতটা যাবো? কোথায় গিয়ে থামবো? কোন্ দিকে টার্ন নেবো—ও সব কথাও তো জানা দরকার।

ভদ্রলোক কি আর দাঁড়িয়ে আছেন অত কথা শোনবার জন্য। যেন জাদুকরের পুতুল উধাও। ডানে বাঁয়ে সামনে পিছনে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কোথাও আর তাঁকে দেখতে পাওয়া গেলনা। হঠাৎ

দেখা দিয়ে তিনি হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন যেন বিজলীর আঁকাবাঁকা রেখাটি।

চলা তো যাক্। পথে কি পথিকের অভাব হয় কখনও। আরেকজনকে শুধিয়ে নেওয়া যাবে।

যেখানে ট্রেন থেকে নেমেছিলাম প্রায় সেখানে আবার এসে গেছি। পথে আর কারও সঙ্গে দেখা হয়নি।

একটা চায়ের দোকানে কেটলির মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরচ্ছে। কিন্তু চা খাবে যে খদ্দের কোথায়? দোকানীর কাছে গিয়ে শুধোই, "আচ্ছা, কানাইবাবুর বাসাটা কোন দিকে দাদা?"

উত্তর পাইনে। তবু দাঁড়িয়ে থাকি আশা নিয়ে। অবাক হয়ে দেখি, এত বেলাতেও দাদার চোখেমুখে ঘুমের আমেজ। যেন ঢুলতে ঢুলতে কাজ করছে। হঠাৎ মনে হল—এই কি নিরাসক্ত অবস্থা মানুষের! আমাদের চাইতে বয়স কম হবে ঢের। তবুও তো দাদা বলেই সম্বোধন করলাম। উত্তর দিচ্ছেনা কেন? আবার শুধোলাম, "হে ভাই, একটা কথা জানতে চাই।"

একটু তাকাল। আবার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ভাঙ্গা টেবিলের উপর পাতা কটা পেয়ালায় চা সেদ্ধ জল ঢালতে থাকল। কিন্তু খদ্দের কোথায়? ডানে বাঁয়ে দেখি চেয়ে—না, কেউ নেই। আমাদের জন্যই ঢালছে না ত?

আবার শুধোই, "ও দাদা, কানাইবাবু পেশকারকে চেনো না?"

এতক্ষণে কথা ফুটলো ওর মুখে। বললো, "এখানে কোথায়? এগিয়ে যান। অনেকটা এগিয়ে যান। দেখবেন দু পাশে অনেক দালানকোঠা। সেখানে সব বাবুদের বসত বাড়ি। কাউকে না কাউকে শুধিয়ে নেবেন।"

আবার চলি যেদিক থেকে এসেছিলাম সেদিকে। চোখে পড়ে সেই টিউবওয়েলটা। কিন্তু বৈষ্ণব আর বসে নেই, তার কাজ সেরে

চলে গিয়েছে কোন দিকে। আমরা এখনও ঘুরপাক খাচ্ছি একই জায়গায়।

একটা নাম লেখা শ্বেতপাথরের ফলক চোখে পড়ল। পথ থেকে ডান দিকে একটু দূরে ভিতরে। নিশ্চয় কোনো ভদ্রলোকের বসতবাটি। খোলা গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন কে একজন একটা গাছের ছায়ায়—বুঝি তাঁরই ঘরের সমুখের বাগানে। শুধোই তাঁকে কানাইবাবুর পরিচয়। তিনি বলেন, "কানাইবাবু ? কানাই কি ?"

বুঝতে পারলাম পদবী জানতে চাইছেন। বললাম, "কানাইলাল দাস, এস. ডি. ও. সাহেবের পেশকার। বাড়ি নান্নুর। সেই নান্নুর যেখানে আছে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভিটে আর তাঁর আরাধ্যা দেবী বাশুলি দেবীর মন্দির।"

ব্রহ্মচারী আমার কথায় জোড়া লাগিয়ে বলে, "রজকিনী রামীকে জানেন—চণ্ডীদাসের সাধন সঙ্গিনীকে ? সেই রামীরই উত্তরপুরুষ বলে দাবী করেন আমাদের কানাইবাবু।"

ভদ্রলোক বললেন, "না মশায়, কানাই দাস টাস কাউকে জানিনে। একজন কানাই মুখুজ্জে থাকেন এই রামপুরহাটে—তাঁকে শুধু জানি। তবে হ্যাঁ, হয়ত আছেন, কানাই দাস। এগিয়ে যান, আর শুধিয়ে যান, একখানে না একখানে পেয়ে যেতেও পারেন।"

কাছে দাঁড়িয়ে আরেকজন শুনছিলেন। বললেন, "কিন্তু তিনি এখন এখানে নেই ; সিউড়িতে বদলী হয়েছেন। আপনারা তাঁকে এখানে খুঁজতেই বা যাবেন কেন ? তার চাইতে অন্য কাউকে খুঁজুন, না হয় বাড়ি ফিরে যান।"

একে অন্যের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে আমরা বললাম, "কানাইবাবু নিজে বলেছিলেন যে তিনি রামপুরহাটে থাকেন।"

"তাহলে দেখুন গে খুঁজে। মরুন গে ঘুরে ! আমি মশায় যা জানি বললাম।"

ধৈর্যেরও সীমা আছে। বেলা অনেক হয়েছে। শরৎকালের সূর্যের তাপে কোথাও এতটুকু কমতি নেই। ভুলেও এক টুকরো মেঘ এসে একটু সময় মার্তণ্ডকে আড়াল করে রাখেনা। মুহূর্তের জন্য ঠাণ্ডা হয়না ধরিত্রী। অন্তত পথে যারা একটানা ক'দিন ধরে হাঁটছে তাদের এমনই মনে হয়। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে কানাইবাবুর বাসাটা খুঁজে পাওয়া গেলনা। এটা একটা অশুভ লক্ষণ বলেই মনে হল আমাদের।

এই জায়গাটা একটু তবু ঘিঞ্জি। একটা লোক'ও আবার দেখা গেল। একটা বাঁকের দু দিকে শিকেয় ঝুলিয়ে কি নিয়ে যেন যাচ্ছে। একদিকের একটা হাঁড়ি মুখে কাপড় বাঁধা, অন্যদিকে বিরাট এক মাটির ঢেলা। গয়লা নিশ্চয়।

শুধোলাম তাকে, "ও দাদা, একটা কথা ?"

"ভালো ঘি বাবু ! একেবারে ফাসকেলাচ !"

বললাম, "আর ভালো ঘি ! ঘি কি এই কালে ভালো হয় ?"

"কেন হবে না, এই দেখুন !" বলতে বলতে সে কাঁধ থেকে বাঁকটা নামিয়ে বসে পড়ল পথের মাঝখানে। চোখেমুখে ফেটে পড়েছে তার চ্যালেঞ্জ—"ঘি ভালো হয়না ; এই দেখুন !" হাঁড়ির ঢাকনা খুলে আঙ্গুলে করে খানিকটা ঘি তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল আমাদের দিকে।

বললাম, "ভাই ঘিএর কথা আমরা বলছিনে। ঘি আমরা কিনবোনা। একটা কথা জানতে চাইছিলাম তোমার কাছে।"

সে বিরক্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঢাকা আবার হাঁড়ির মুখে লাগিয়ে নিয়ে বাঁক ঠিক করতে করতে বলল, "কি কথা ?" সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। এক পা বাড়িয়েই আবার হাঁক ছাড়ল—ঘি চাই ই, ভালো ঘি, খাঁটি গাওয়া ঘি···ই ··ই"

•

এযে প্রায় শহর ছাড়িয়ে চলেছি। পাওয়া তাঁকে আর গেলনা

তাহলে ! তিন জনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি—কিং কর্তব্য-মতঃপরম !

হঠাৎ ব্রহ্মচারী বলল—"চরৈবেতি, চরৈবেতি। চলতে থাকো, চলতে চলতেই পথ পেয়ে যাবে।"

ওষুধের শিশি হাতে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে একটা লোক। নিশ্চয় কোন জটিল রোগী আছে বাড়িতে। একে দাঁড় করানো কি ঠিক হবে! ব্রহ্মচারীর ঘোর আপত্তি। তবুও আমি ধীরে ধীরে যেন আপন মনেই বললাম, "কানাইবাবুর বাড়িটা কোনদিকে জানেন দাদা ?"

এত ব্যস্ত লোকটাও শুনতে পেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বললো, "আর একটু এগিয়েই পাবেন। মনে রাখবেন যেখানে গরু, সেখানেই কানাই !"

কথাটা বলে সে যেন উড়ে চলে গিয়ে চোখের আড়াল হল।

মনে মনে ভাবলাম, এ কি ঠিক কথা বলল, যেখানে গরু সেখানে কানাই। তার মানে কি ? ব্রহ্মচারী বলল, "হয়ত কানাইবাবুর বাড়ির কাছে কোনো গোয়াল আছে, তাই এমন নিশানা দিয়েছে। ব্যস্ত লোক একটা ইশারা দিয়ে কম সময়ে বেশি কথা বলে গেছে। আর আমাদের ভাবনা নেই। এবার বলো, "তারা মাঈ কি—জয় !"

দুই

মনে পড়ল সেই বৈষ্ণবের গানটাও—গোষ্ঠে থাকেন কেষ্ট ঠাকুর। তাহলে কি বৈষ্ণবই ঠিক বলে দিয়েছিল! আমরা তখন বুঝতে পারিনি। বললাম সঙ্গীদের, "দেখলে ত, সেই বৈষ্ণবকে ঠাট্টা করেছিলে। সে জন্যই এতটা ঘুরতে হল। এত সময় নষ্ট হল মিছেমিছি। এত লোকের উপর সকাল থেকেই মন আমাদের ক্ষেপে উঠল।"

"বুঝলাম, বুঝলাম। আগে পেয়েই নাও কানাইবাবুকে। তারপর প্রশংসা শতমুখে করো তোমার সেই বৈষ্ণবের।"

সত্যিই ত—এসে গেছি। হ্যাঁ, বাঁ দিকে একটা চালায় কয়েকটা গরু বাঁধা আছে। সত্যি সত্যি ডান দিকে একটা গলিপথ বেরিয়েছে একটু এগিয়ে। আর সত্যিই আছে মোড়ের উপর একটা পুরনো বাড়ি। সম্ভবত এটাতেই থাকেন কানাইবাবু।

কিন্তু এর যে দরজাজানালা সব বন্ধ! তাহলে?

খুঁজে বের করা গেল। যেদিকে বাড়ির সামনা হওয়া উচিত ছিল সেদিকে নয়। পিছন দিকে যেন এর প্রবেশ পথ। কড়া নাড়তেই একটি লোক এসে মুখ বাড়াল। তাকে দেখে মনটা দমে গেল। এ মুখ কানাইবাবুর নয়। তবু শুধোই, "এখানে কানাইবাবু থাকেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এখন রয়েছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

সঙ্গীদের দিকে একবার চ্যালেঞ্জের দৃষ্টি হেনে আবার বলি,—

"একবার ডেকে দিতে পারো ওঁকে ?"

সে ফিরে এসে বলল, "আসুন আপনারা, ভিতরে আসুন।"

দোতলায় তাঁর ঘর। কিন্তু কি রকম যেন অন্ধকার অন্ধকার। জানালা দরজা খোলেন না বুঝি ! বাইরে থেকে দেখা যায় ভিতরের টেবিলটা। তাতে কাগজপত্র ছড়ানো—যেন ধান চাল ঢেলে রাখা। কোণায় একটা কেরোসিন ষ্টোভ, দু'তিনটে বোতল, গোটা তিনেক এলুমিনিয়মের থ্যাবড়ানো বাটি। পাশেই একটা বিছানা। এই কি কানাইবাবুর আস্তানা ?

উঁকি দিয়ে দেখি তিনজনেই। কই ? এ ঘরে তো তিনি নেই। তা হলে ?

পাশের ঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে হঠাৎ বলে উঠলেন, "মনে তাহলে রেখেছেন ?"

চিনতে পারলাম তাঁকে। গোলগাল সেই মুখ। অভ্যর্থনা করলেন নীরবে জোড়হাতে। তারপর হঠাৎ গলায় জোর দিয়ে বললেন, "আসুন ভিতরে এসে বসুন !"

দাঁড়িয়ে ছিলাম ছোট্ট বারান্দায়। ভাঙা রেলিঙে ভর দিয়ে কথা বলছিলাম কানাইবাবুর সঙ্গে। সঙ্গীরা বলল, "এই বাইরেই বসিনা কেন ?"

"বেশ, আপনাদের যেমন ইচ্ছে !"

ইচ্ছে মতোই কাজ করি। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারি, এতে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয়নি। সকালের সবটুকু রোদই পড়েছে এসে আমাদের চোখেমুখে। শেষে আর কি করা—ছাতা ধরে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা চলল।

কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ে—কানাইবাবু এখানে সপরিবারে

নেই। রান্নাঘরের হাঙ্গামা চুকিয়েছেন কি তাহলে ঐ স্টোভ আর দু বোতল কেরোসিনে ? আশা সর্বনাশা। আশাই মানুষকে ছুটিয়ে ছুটিয়ে মারে। কত কি ভেবে এসেছিলাম কানাইবাবুর বাসায়! নান্নুরের বাড়িতে যাঁর হাতের লুচি পুরি হালুয়া পেটপুরে খেতে পেয়েছিলাম তিনি তাহলে এখানে খেতে দেবেন না আমাদের ? কানাইবাবুর পত্নীর ঘোমটা ঢাকা মুখখানি মনে পড়তে লাগল। যেমনি লক্ষ্মী, তেমনি অন্নদাত্রী। তিনিই এখানে নেই ত আর দেরি করে লাভ কি ?

কানাইবাবুরও বোধ হয় কোর্টের সময় হয়ে এল। তিনি কি আর এখন আমাদের জন্য লুচি পুরি তৈরি করতে যাবেন। বড় জোর চা এক কাপ মিলতে পারে সেও হয়ত দোকান থেকে আসবে।

কিন্তু চা যে অচল আমাদের। তিনজনের দুজনেই চা খাইনে। তাহলে ? পেটের ক্ষিদেটা হঠাৎ মনে উঠে এল। হঠাৎ যেন চঞ্চল করে তুলল। আশায় কাটা পড়লে মানুষের মন শিশুর মতো থেকে থেকে কাঁদে—ভালো করে বুঝলাম সে কথাটা।

চোখে ভেসে উঠল কানাইবাবুর ছেলের মুখ। কানাইবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের মূলে রয়েছে সেই ছেলে। কতবার পথে পথে ঘুরতে বেরিয়েছি, কত মানুষ দেখেছি, কিন্তু সকলের মুখ মনে আঁকা থাকে না। অনেকের মুখ মনে থাকলেও স্পষ্ট থাকে দু চারজনের। কানাইাবুর ছেলে তাদের একটি।

বছর খানেক আগে নান্নুর গিয়েছিলাম আমি আর ব্রহ্মচারী। চণ্ডীদাসের ভিটে আর বাশুলিদেবীর মন্দির দেখে সাধ মেটেনি। অনেক পথ হেঁটে আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধে হয়ে এসেছিল। একটু থাকবার জায়গা প্রার্থনা করেও পাইনি। সেবাইতরা ডাকবাংলো দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ব্রহ্মচারী তবুও ওদের

খোশামোদ করতে চায়। আমি বাধা দিই। বলি, "না, এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা চলে না। চণ্ডীদাসের স্মৃতি ধুয়ে যারা জল খায় প্রতিদিন, তারাই যদি আশ্রয় না দেয়, একমুঠো প্রসাদ না দেয় তাহলে ডাকবাংলোয় গিয়ে থেকে কোন্ পুণ্যটা হবে।" আমি ব্রহ্মচারীকে তখন অরাজক রাজ্যে গুরুশিষ্যের সেই পুরনো গল্পটা বলি। গল্প শুনে সে বলে, "তুমি যা বললে বুঝলাম, কিন্তু আবার কবে আমাদের এখানে আসা হবে তার ত কিছু ঠিক নেই। হয়ত জীবনেই আর এ দিকে আসতে পারবনা। সুযোগ হবে না। তাই বলছি, শুনেছিলাম, এখানে কাছেই আছে রামীর বাড়ি। সে যদি না দেখে যাই, তাহলে আমাদের এ পরিক্রমা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।"

গরম কালের পরিক্রমায় যত ক্লেশ তার উপর অস্নান অনাহার। দেহযন্ত্র বিগড়োয় নানারকমে। কপালের শিরাগুলো দপদপিয়ে টনটনিয়ে ছিঁড়ে পড়তে থাকে। তখন এক এক বার মনে হয়, কেন বেরলাম মরতে। বেশ তো ছিলাম ঘরে বাড়িতে সুখে শান্তিতে। সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে—শান্তিতে যদি ছিলাম তাহলে বেরলাম কেন? সত্যি কি হুজুকে পড়ে!

দ্বিতীয় রিপুর উত্তেজনায় লম্বা পা ফেলে তবু চলি নান্নুর গ্রামের এক গলিপথ বেয়ে। সংকল্প—গ্রামান্তরে যাওয়া।

হঠাৎ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্রহ্মচারী বলে, "বড় সুন্দর একটা গাছ। চট করে স্কেচ করে নিই।" বলে সে খাতা পেনসিল নিয়ে আঁকতে লেগে গেল।

ছুটো ছোটো ছেলে ছুটে এলো ওর ছবি আঁকা দেখতে। স্কেচ করা শেষ হয়ে গেলে একটা ছেলে বলল, "আপনারা ছবি আঁকেন বুঝি?"

আমি বললাম, "আমি আঁকিনে। ইনি আঁকেন।"

ছেলেটি বলল, “আপনারা চলুন আমাদের বাড়িতে।”

বললাম, “না, আমাদের সময় নেই। অন্য জায়গায় যেতে হবে। দেখছ না কেমন তাড়াতাড়ি হাঁটছি!”

ছেলেটি হঠাৎ আমাদের সামনে গিয়ে দুটি হাত দুদিকে ছড়িয়ে দুটো পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলল, “পথ নেই···প থ···নে ই···”

আমার ছেলেবেলার কয়েকটা দিন তখন ঝপ্ করে পড়ল যেন স্মৃতির আকাশ থেকে। মুহূর্তে এমন কত ছবি আমার মনে ঝলকানি দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। অবাক হয়ে আমি নিজেকেই দেখতে লাগলাম ঐ ছেলেটার মধ্যে। এ রকম ‘পথ নেই পথ নেই’ খেলা আমরাও কত করেছি কত অচেনা পথিকের সঙ্গে। আজ আমরাই হয়েছি সেই অচেনা পথিক।

আমি কোনো কথা বলবার আগেই ব্রহ্মচারী বলল, “খোকা, পথ যদি নেইত, ঘর আছে নিশ্চয়!”

ছেলেটি সপ্রতিভ স্বরে উত্তরে দিল, “হ্যাঁ, এইত কাছেই। আসুননা আমাদের বাড়িতে। বাবা মা কত খুশি হবেন!”

ওর গলা শুনেই এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। হাত জোড় করে বললেন, “নমস্কার! আজ্ঞে, আপনাদের কোথা থেকে আসা হয়েছে?”

আমরা বললাম।

“কোথায় যাওয়া হবে?”

“বৈরাগীতলায়।”

“শুনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন। বললেন, “বৈরাগীতলায়? এই অবেলায়? সে ত এখান থেকে ছ মাইল। বেলা পড়ে গেছে। তা ছাড়া পথও ভালো নয়। আপনারা যেতে পারবেন কি? পথেই রাত হয়ে যাবে। যদি কিছু মনে না করেন আপনাদের আমি দুটো কথা বলতে চাই। একটু আসবেন এ দিকে?”

ছোট্টো একখানি উঁচু ভিতের ঘর। বুঝি চণ্ডীমণ্ডপ। এরই

বারান্দায় একখানি শতরঞ্চি তিনি পেতে দিলেন। আমরা বসলাম।

"কখন আপনারা এই গ্রামে এসে পৌঁছেছেন?"

"সকাল বেলায়?"

"কোথায় উঠেছিলেন? খাওয়াদাওয়াই বা কোথায় হল?"

"ইস্কুলবাড়িতে বসে পাঁউরুটি খেয়েছি। ওখানে একটা টিউব-ওয়েল ছিল, তাই।"

"আমার এখানে চলে এলেন না কেন?"

উত্তরে ব্রহ্মচারী পূর্ব ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করল।

শুনে নিয়ে তিনি বললেন, "আপনারা কিছুতেই এখন এ গ্রাম ছেড়ে যেতে পাবেন না। চণ্ডীদাস এখন নেই। কিন্তু তাঁর পায়ের ধুলো ত রয়েছে। আপনারা আমার বাড়িতে ত আসেননি—চণ্ডীদাসের স্থানে এসেছেন। এখন যদি অভুক্ত চলে যান তাহলে তাঁরই অপমান করা হবে। এখন যা আপনাদের ইচ্ছে, করুন।"

আমরা রয়ে গেলাম। ভদ্রলোক তাঁর নিজের জীবনের ছবি এঁকে চললেন আবেগমাখা ভাষায়। অনেক কথা বলে শেষে বললেন, "সিনেমা কখনও দেখতে যাইনি, তবু দেখতে গেলাম চণ্ডীদাস। দেখে নিরাশ হলাম। রামী কখনও কাপড় কাচেনি, চণ্ডীদাস বঁড়শি বায়নি। যত সব গাঁজাখুরি রচনা দিয়ে মহা-পুরুষদের শ্রাদ্ধ করছে আমাদের দেশের কতগুলো অর্থের কাঙাল মানুষ।"

তারপর প্রথমে একবার চা আর মুড়ি নিয়ে এলেন। চা এ আপত্তি জানালে বললেন, "ক্ষিদেয় আপনাদের মাথা ধরে আছে। গরম চায়ে চুমুক দিন, মাথা ধরা সারবে। অন্তত একবার পরীক্ষা করে দেখুন।"

পরীক্ষা করা গেল। কিছু ফলও হল।

তারপর তিনি আমাদের নিয়ে একটু ঘুরলেন। কথা বলতে বলতে হঠাৎ হঠাৎ “মা তার”, “মা তারা” এমন অভিভূত হয়ে উচ্চারণ করেন যে তাঁর চোখ ছলছল করে ওঠে। বার বার বলতে থাকেন, “যাবেন, অবশ্যই যাবেন একবার তারাপীঠে। আপনারা যখন অনেক তীর্থ ঘুরেছেন, তারাপীঠও যেন বাদ না থাকে।”

রাত্রিবেলা আবার খাওয়ার জন্য ডাক পড়ল। আমিষ নিরামিষ দুরকমই আছে। ব্রহ্মচারী আমিষ, আমি নিরামিষ। উনি বললেন, “আপনারা আশ্চর্য এক সঙ্গে চলেন, অথচ দুজনের খাবার দু রকমের!”

খুব বেঁচে গেলাম যে উনি জানেন না সঙ্গীকে আমি ব্রহ্মচারী বলে ডাকি। তাহলে হয়ত প্রশ্ন করতেন, ‘ব্রহ্মচারী আমিষ খায়, আর অব্রহ্মচারী খায় নিরামিষ সে কি করে হয়?’

লুচি তরকারি। তরকারি অনেক রকমের। কাজেই লুচি বারে বারে ফুরিয়ে যাচ্ছিল। আর বারে বারে লুচি দিচ্ছিলেন তাঁর পত্নী। আমি নিতে ইতস্ততঃ করছিলাম। তিনি তাই বললেন, “কোন ভয় নেই। যা খাচ্ছেন সব কিন্তু ঘুষের ঘি দিয়ে ভাজা। বাজারের ঘিতে ভেজাল থাকে, কিন্তু ঘুষে ভেজাল দিলেত কাজ উদ্ধার হয় না।”

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। শেষকালে ব্রহ্মচারী আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “শুনলে ত?”

তিনি বললেন, “বুঝতে পারেননি আপনারা। কোর্টে কাজ করি। আমি না চাইলেও কত লোক এটা সেটা আমার বাড়িতে এনে পৌঁছে দিয়ে যায়। তখন আমি বারণ করলে তারা মানবে কেন!”

অবাক হয়ে ভাবি তাঁর সরলতার কথা। এই সেই কানাইবাবু। তাঁর কাছে বসে আজ এক বছর পরে শুনছিলাম তাঁর ছেলের বিষয়ে।

ছেলের নাকি পড়াশুনোয় তেমন মন নেই। তিনি ছেলেকে কত কিই আশা করেছিলেন। কিন্তু ওকে দিয়ে কিছুই যেন হবে না। তাই জন্য তাঁর বড় দুঃখ আর দুশ্চিন্তা।

প্রথমটা বুঝতে না পেরে শুধোই, "আপনার কোন ছেলের কথা বলছেন ?"

"সেই যার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আপনাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।"

বললাম, "সেই ছোট্টোটি এখন এত বড় হয়ে গেছে যে, পড়াশুনোয় আর তার মন নেই বলছেন ?"

তিন

সেদিন যখন আমরা নান্নুর গ্রাম ছেড়ে আসি সেই ছেলেটি একটা সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে এসেছিল আমাদের পথ এগিয়ে দিতে। চণ্ডীদাস হাসপাতালের কাছাকাছি এলে পর আমরা তাকে বলি, "এবার তুমি বাড়ি ফিরে যাও ভাই!"

সাইকেলটা চটপট মাটিতে শুইয়ে রেখে সে ঢিপ করে প্রণাম করল আমাকে। তাকে জড়িয়ে ধরে ভাবলাম, এ কি! মাত্র ত কয়েক ঘণ্টার পরিচয়। বুকটা ভরে উঠল ব্যথায়—এখনই একে ছেড়ে যেতে হবে!

ছেলেটির চোখ থেকে ধারায় জল গড়িয়ে চলল। অতি কষ্টে আটকে আসা গলায় সে বলল, "যাবেন কিন্তু রামপুরহাটে—আমাদের বাসায়। ওখান থেকে আমি আপনাদের তারাপীঠে নিয়ে যাবো!"

আজ কত দিন পরে সেই রামপুরহাটের বাসায় আমরা এসে পৌঁছলাম, কিন্তু সেই ছেলের দেখা পেলাম না। সে না আমাদের তারাপীঠে নিয়ে যাবে বলেছিল!

বললাম কানাইবাবুকে, "কোনো প্রকার পীড়ন করবেন না ছেলেকে। চেষ্টা করবেন ছেলের মন বুঝতে। আমাদের দেশে অনেক মা বাবাই ছেলের মনটি না বুঝে গতানুগতিক ধারায় পড়াশুনোর চাপ দিয়ে ছেলের জীবনটি মাটি করেন। ছেলেকে কখন কোন্ কথাটি বলবেন সেটি সব সময় খুব হিসেব করে বলবেন—বিশেষ করে বেয়াড়া ছেলেদের মন জুগিয়ে চলাটা অনেক

ধৈর্য ধরে কষ্ট করে অভ্যেস করতে পারলে শেষ পর্যন্ত ভালো ফল হয়।"

কানাইবাবু বললেন, "কি করি বলুন, একটা এমনি মমত্বে অন্ধ করে রেখেছে আমাদের যে একটু এদিক ওদিক চললেই মনে হয় ছেলে আমার সর্বনাশ করল বুঝি!"

বললাম, "এমনটা হয় যে তার কারণ এই, আমরা নিজেদের খুব বেশি করে প্রভু বলে মনে করি। যত্ন করবার মন আমাদের থাকেনা। মা বাবার স্নেহের সঙ্গে যদি যত্নটুকু থাকে আর প্রভুত্বটি বাদ পড়ে তাহলে ছেলের মন সব সময় মা আর বাবার আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়। এর ব্যতিক্রম হলে মা বাবার কাছ থেকে সব সময় ছুটে পালাতে চায়।"

কানাইবাবু বললেন, "ঠিক কথাই বলেছেন। একেবারে যেন আমার জন্যই আপনি বললেন এই কথাগুলো। থাক্, এবার আপনারা দু জনে খান একটু ঘোলের সরবৎ আর এই যে আপনার নিশ্চয় চা চলে?"

সিদ্ধবাবা শান্ত একটুকু হাসি দিয়ে বলে, "আপনি বুঝি জ্যোতিষ বিদ্যা জানেন?"

কানাইবাবু বললেন, "কেন বলুন ত?"

"তা যদি না হবে ত কেমন করে জানলেন যে ওরা চা খাননা আর আমি চা পেলে আপত্তি করিনে। জানেন, ভারতবর্ষের দার্শনিকরা দারুণ গ্রীষ্মেও ঠাণ্ডা জল পান করতেন না!"

"আপনি বুঝি ফিলজির ছাত্র; তা আমারও ছিল ঐ সাবজেক্টই। কিন্তু তার দৌড় এই তো দেখতে পাচ্ছেন—চোর বাটপার জালিয়াত যত মানুষের দরবার নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরি দিন রাত। পড়াশুনোর ফল কি এই পেলাম জীবনে?" বলতে বলতে চোখ মুছলেন কানাইবাবু।

বললাম, "আপনার জীবিকার জন্য যে কাজ নিয়েছেন সে বুঝি আপনার মনের মতো হয় নি ?"

"সে আর কি বলবো। বাইরে থেকে লোকে ভাবে আমি মহা সুখে আছি। পেশকারবাবুর কিসের অভাব! কিন্তু…"

বললাম, "কিন্তুর কি আছে। সত্যিই ত আপনার কোনো কিছুর অভাব নেই। ঘরে যাঁর এম সতীসাবিত্রী অন্নপূর্ণা ঘরণী, যার এমন সুন্দর ছেলে, তাঁর অভাব কিসের সংসারে ?"

"অভাব মানুষের চোখে ধরা পড়েনা। অভাব থাকে চোখের আড়ালে। তা না হলে কারও জীবনে অভাব থাকতে পেত কি ? যান, দেখে অসুন গে বামার সিদ্ধপীঠ। ওখানে গেলেই বুঝতে পারবেন অভাব ব্যাপারটা কি ? অভাবকে যিনি ভাবে পরিণত করতে পেরেছিলেন দেখে আসুন গে সেই ক্ষ্যাপার সিদ্ধাসন। ভোগ বাসনায় ইতি দিয়ে স্থির হয়ে তিনি বসতে পেরেছিলেন। তাইত ছুটে যাই মাঝে মাঝে আমিও তাঁর কাছে। বসে থাকি গিয়ে কিছুক্ষণ তাঁর পায়ের তলায়, যখন আর টিকতে পারিনে সংসারের জ্বালায়। মনের কথা খুলে সব বলি বামাকে। বলি তুই যদি পথ পেলি, আমাকেও পথ দেখিয়ে দে। পথ ধরিয়ে দে!"

কানাইবাবুর কথার উত্তর না দিয়ে ভাবছিলাম নীরবে তাঁরই কথা। দেখতে এসেছি তাঁর সুন্দর দোতলা বাড়ি। উঠানে পর্বতপ্রমাণ ধানের মড়াই। গরুমোষে গোয়াল ভরতি। অভাব নেই অন্নবস্ত্রের। পত্নী তাঁর সুগৃহিণী। তবু কেন তিনি সুখী নন সংসারে ? নিরবচ্ছিন্ন সুখ তাহলে কার আছে ? দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টাতেই সুখের এক আধটু স্পন্দন জাগে বুঝি ! তাইতেই কি মানুষ শক্তি পায় সংসার আঁকড়ে থাকবার মতো ! তা না হলে কি আর পাশাপাশি এত ঘর আর এত মানুষ তৈরি হয়ে উঠত এত সব বৈচিত্র্য নিয়ে !

কানাইবাবু কত কথাই বললেন। কিছু নিলাম স্মৃতির কৌটোয় পুরে আর কিছু রেখে এলাম তাঁর ঘরের চার দেওয়াল ঘেরা আকাশে বাতাসে। আইন আদালতের কাঠগড়ার কাছাকাছি জায়গায় যাঁদের কর্মস্থান জানতাম তাঁরা অশ্রুহীন, কিন্তু কানানাইবাবু সে ধারণা উল্টে দিলেন। তাঁর মধ্যে আদালতের আমলা ছাড়া আরও একজন যিনি রয়েছেন তিনি আমাদের তৃপ্ত করলেন। সংসারে মানুষের জন্য তৃষ্ণ বাড়ালেন।

"রোদ কড়া হবে ক্রমে। মায়ের নাম নিয়ে আপনারা বেরিয়ে পড়ুন। কোনো ভয় নেই। যাঁর উদ্দেশে যাত্রা তিনিই টেনে নেবেন তাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে।"

কানাইবাবুর কথায় সায় দিয়ে সিদ্ধবাবা বলল, "নিশ্চয় মা যদি না টানবেন তাহলে আমরা কি এদ্দূরই আসতে পারতাম। ক্ষুদ্র মানুষ, আমাদের আর কতটুকু সাধ্যি!"

জোড়হাত বুকে ঠেকানো অশ্রুসজল চোখ কানাইবাবু বিদায় দিলেন আমাদের।

দুদিকে সারি সারি ঘর বাড়ি। মাঝখান দিয়ে সংকীর্ণ পথ। খোঁচা খোঁচা ইট বেরিয়ে আছে। পথের মাটির সঙ্গে ওদের বনিবনাও হয়নি। আমার খালি পায়ে বড় লাগে। গরুর গাড়ি মোষের গাড়ি চলছেই অনবরত। ওদের আবির্ভাবে পথের প্রস্থ আরও যেন কমে যায়। পথ ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। সাবধানে চলি পাড়াগাঁয়ের নূতন বউএর মতো ক্ষণে ক্ষণে সঙ্কুচিত হয়ে।

কতক্ষণ এমনি চলবে কে জানে। গাড়িগুলো না যায় আগে, না পড়ে পিছনে। আমরা যতটা হাঁটি ওদের চাকার গতিবেগও ততটা। কেউ কাউকে হটিয়ে যেতে কাটিয়ে যেতে পারিনে।

হঠাৎ একেবারে পথ বন্ধ। একটা গরু শুয়ে পড়েছে। বুঝি আর

টানতে পারছে না। গাড়োয়ান গাড়ি থেকে লাফ মেরে নেমেছে। গরুটার গলায় দড়ির ফাঁস লেগেছে। আহা কি কষ্ট! এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে মারা পড়বে গরুটা।

ব্রহ্মচারীর হাতে থালিটা দিয়ে আমি এগিয়ে যাই। পকেট থেকে ছুরিটা বের করি। গলার দড়িটা কেটে দিলেই গরুটার মুক্তি। আমাকে দেখেও গাড়োয়ান শপাং শপাং করে চাবুক লাগায় গরুটাকে। একেই বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। চাবুক যেন পড়ছে আমারই পিঠে। থেকে থেকে আঁৎকে উঠছিলাম। মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়! নিরীহ জীব। কথা বলতে পারেনা বলে সে এত মারটা মারল!

গাড়োয়ানের নিষ্ঠুরতার কথা ভাবছি আমি তন্ময় হয়ে এমন সময় হঠাৎ গরুটা উঠেই ছুটছে গাড়ি কাঁধে নিয়ে। অবাক হয়ে ভাবি, এ আবার কি কাণ্ড! গাড়োয়ানের চাবুকই তাহলে ওর ওষুধ। ভাগ্যিস্ গাড়োয়ানকে কিছু বলে ফেলিনি ওর নির্দয়তার নিন্দে করে আমি। পথে বেরলে কত অজানা জিনিসই না জানা যায়।

একটু যেন বেশি আলো চোখে পড়ছে। পথটা বেঁকেছে দক্ষিণ দিকে। পড়ছে গিয়ে খোলা মাঠে। দুদিকে ধানের জমি। মাঝখানটা একটুকু উঁচু। এখন আর ইট নেই পায়ের তলায়। অন্য অস্ত্র আছে। বর্ষাকালের কাদা বর্ষার ছাপ ছাঁচ হয়ে সেঁটে আছে। পায়ের তলায় ওগুলো এমনি কামড়ে ধরে যে মনে হয় পায়ের মাংস খুলে নিচ্ছে। কতক্ষণ এমনি চলবে তাই বা কে জানে!

মাঠ। এবার আরও খোলা মাঠ। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে শুধু পথের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলছি আমরা। সিদ্ধবাবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আর উচ্চারণ করে, "মাগো তারা, তোমায় ছাড়া ভাগ্যহারা, এ তিনজনা।"

সম্মুখে একটু দূরে বাগানের মতো একটা জায়গা দেখা যায়।

ক জন লোকও বসে আছে ওখানে। বিশ্রাম করছে মনে হয়। আমরা আরেকটু কাছাকাছি হতেই ভার কাঁধে নিয়ে ওরা উঠে পড়ল. কোথায় ওরা যাবে কে জানে। কাছে তো কোনো গ্রামের রেখা দেখা যাচ্ছে না।

নাই বা দেখা গেল। পথ হাঁটতে হাঁটতেই ওরা এক সময়ে পেয়ে যাবে ওদের গন্তব্য। আমরাও তেমনি হেঁটে হেঁটে এক সময়ে পৌঁছব গিয়ে ঠিক তারামায়ের মন্দিরে। ওরা কোথায় যাবে যেমন আমরা জানিনে, আমরা কোথায় যাবো সেও ওরা জানেনা। হয়ত ওরা খোঁজও রাখেনা আমাদের। এ সংসারে কেই বা কার খোঁজ রাখে। অনন্তকাল ধরে এই পথ চলারই কথা বলা থামে না তবু মানুষের। পথ শেষ হয় না। কথা বলাও বন্ধ হয়না। এই জন্যেই কি আমিও আবার আমার কথা বলতে শুরু করেছি তারা-পীঠকে আর তারামাকে উপলক্ষ্য করে? অনেক দিন অনেক বার ভেবেছি। একটু আধটু লিখেও তাই রেখে দিয়েছি ফেলে। কি জানি একটা সঙ্কোচ এসে বার বার আমাকে নিরস্ত করতো। কিন্তু আমার মুখ থেকে যে বন্ধুরা আমার পথের কথা শুনেছিলেন তাঁরা আমাকে রেহাই দিলেন না। বললেন—"এ গল্প তোমাকে লিখতেই হবে।"

আমি বললাম, "গল্প তো নয়!"

ওরা বললেন, "ওই হল। তুমি আর দেরি করোনা। কলম নিয়ে বসে যাও।"

পথ চলছি। দৃষ্টি সব সময় সম্মুখে। এবার একটা ডোবা মতো কি দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, সামান্য জলও রয়েছে। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সবার আগে ডোবাটার পাড়ে গিয়ে দাঁড়ালাম—জল ঘোলা নয়। মনে হয় কে যেন খানিকটা ফিটকিরি ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল। তা নইলে এত ফরসা হয় একটা অরক্ষিত জায়গায় খোলা মাঠের মাঝখানে এই বীরভূম জেলার জল? ময়লা সব

থিতিয়ে রয়েছে পরিষ্কার বোঝা যায়। উপরে ভাসছে পরিশ্রুত জল। মুখ লাগিয়ে এই জলে চুমুক দিতে ইচ্ছে যায়।

পথেই একটা অর্জুন গাছ। গাছের ছায়ায় বসে পড়ি। বসলে পরেই শুতে ইচ্ছে যায়। গাছের গুঁড়িতে থলিঝুলি ঠেসান দিয়ে রেখে শুয়েই পড়ি। শুয়ে শুয়ে শুনতে পাই সিদ্ধবাবার সাবধান-বাণী,—"এমন যদি করো তাহলে পথ ফুরোবে না কোনো কালে, বলে রাখছি।"

"তা জানি। কিন্তু পথ আগে তো ঠিক হোক!"

ডানে বাঁয়ে দু ভাগ হয়ে পথ চলেছে দুদিকে। কোন পথে পা বাড়াতে হবে তা ত জানিনে। এখন একজন কাউকে না পেলেই নয়!

কাছে দূরে তাকিয়ে দেখছি তিনজনেই—ছ খানা চোখের প্রখর দৃষ্টি দিয়ে। কারও চোখে পড়ছেনা কোনো মানুষ। তবে কি এই পথে লোক চলাচল নেই একেবারে? অথচ কানাইবাবু বলে দিলেন পথ কিছুই কঠিন নয়!

ব্রহ্মচারী বলল, "দুর্গম পথে সকলে তো পা বাড়ায় না।"

তা না বাড়াক। আমরা যখন বাড়িয়েছি, তখন চলতে তো থাকি!

সিদ্ধবাবার সব সময় সোজা সোজা কথা। আর ব্রহ্মচারী কেবল ভুরু কুঁচকে কিছুটা সত্য, কিছুটা কল্পনা, যতটা সহজ তার চাইতে বেশি কঠিন কিছু মিশিয়ে সব কিছুতে একটা ভয়ের প্রলেপ মাখিয়ে দেবে। ওকে এ নিয়ে কিছু বললেও আবার বিপদ। বিপদ রাগ করে বলে নয়, রাগ করেনা বলেই। ওকে রাগাবার চেষ্টা করলে ওর কল্পনার পাখা আরও বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে!

গাছ থেকে হঠাৎ কয়েকটা পাতা পড়ে মাটিতে। মরা ঝরা শুকনো পাতা নয়। একেবারে টাটকা সবুজ পাতা। দেখতে না

দেখতে আরও কয়েকটা। তারপর আরও। এবার আর সন্দেহ থাকেনা যে গাছের উপর কেউ না কেউ নিশ্চয় রয়েছে। তিনজনেই দাঁড়িয়ে তাকাই উপর দিকে।

সিদ্ধবাবা মুখ গম্ভীর করে বলে, "দেখো, চিনতে পারো কিনা। জীবন্ত মাতৃমূর্তি কিন্তু। ভয় পেয়োনা!"

গাছের দুটো ডালে দুটো পা দিয়ে দাঁড়িয়ে যে ভঙ্গিতে সে তাকালো একলা হলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম।

শুধু জিভে কামড় দেওয়া নেই। তাহলে আর চিনতে হতোনা মানুষ বলে।

চার

কোথা থেকে এক সাঁওতাল মেয়ে এসে একা একা গাছে চড়েছে? এমন খোলা মাঠের মাঝখানে? এতটুকু ভয়ডর নেই বুকে!

মেয়েটি নেমে এল মাটিতে। নির্ভয়ে। অসঙ্কোচে। এতটুকু অবাক হলনা। একটি কথা বললনা। ছড়ানো পাতাগুলো জড় করতে লাগলো আপন মনে। সিদ্ধবাবা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। কালোপাথরে খোদাই করা এই অপূর্ব ভাস্কর্যের শিল্পীকে যেন মনে মনে অনুসন্ধান করতে লাগলো সে।

ব্রহ্মচারী হাত জোড় করে রইল কিছুক্ষণ।

পাতা গুছিয়ে নিয়ে শাড়ির আঁচলে বাঁধল সে। তারপর তেলচুকচুকে খোঁপাটি দুহাতে বেশ করে টিপে টাপে দেখে নিয়ে চলল।

সিদ্ধবাবা উঠে পড়ে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটার কাছে।

মেয়েটা বলল, "কি হুলরে, কেন এইছিস্ তুই আমার কাছে?"

সিদ্ধবাবা চুপি চুপি বলল যেন কি। আমরা শুনতে পেলাম না।

মেয়েটা উত্তর দিল বেশ জোরে জোরেই, "পেয়ে যাবি পথ ঠিক। সুজ্‌জা পথে হেঁটে চল্ কেনে!"

বুকের কাঁপুনি এতক্ষণে থামল। মনে আশঙ্কা ছিল, সিদ্ধবাবা কিনা কি জিজ্ঞেস করে বসে!

দুদিকে সবুজ ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে একটু চওড়া আল মতো। তার উপর দিয়ে আমরা হেঁটে চলি।

চলছি ত চলছিই। এঁকে বেঁকে পথ যে রকম গিয়েছে,

আমরাও তেমনি যাচ্ছি। নূতন করে ভাববার আমাদের কিছুই নেই। মনে পড়ে সাঁওতাল মেয়ের কথা—'পেয়ে যাবি ঠিক !'

কিন্তু সাঁওতালরা কি তারাপীঠে যায় ? হিন্দুদের দেবদেবীকে কি ওরা মানে ?

ব্রহ্মচারী বলল, "ওকি আর সাঁওতাল মেয়ে ? মা স্বয়ং দেখা দিলেন ঐ বেশে !"

হেসে বলি, "তোমার যত সব আজগুবি ধারণা !"

পথের রেখা শেষ হয়ে যায় একটা নিচু মাঠের কাছে এসে। ডানে বাঁয়ে সামনে পিছনে আর পদচিহ্ন নেই একটিও। কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব ! পথ এমন আচমকা এক জায়গায় এসে থেমে যায় কখনও ? তাহলে পথিকের উপায় ?

কাছেই একটা আখের ক্ষেত। সিদ্ধবাবা বলল, "পথ এই আখ ক্ষেতে ঢুকেছে।"

"আখ খেতে নাকি ?"

"রসিকতা করার এটা সময় নয় !"

"এই হচ্ছে রস জমাবার পক্ষে প্রকৃষ্ট কাল। মায়ের কাছে যাচ্ছি। ভাবনা কি ? আমাদের আপদ বিপদ সব মা স্বয়ং দেখছেন !"

এই বলে ব্রহ্মচারী গলার জোরে চেঁচিয়ে ওঠে "কে কোথায় আছ ভাই, আমাদের পথটা বলে দাও না। "

পাগলের কাণ্ড আর কি ! লোকজন কাউকে না দেখে খোলা-মাঠে এমন করে চেঁচানোর কি মানে হয় কিছু ? কে কথার উত্তর দেবে ? এ অরণ্যে না হলেও ময়দানে রোদন করা ছাড়া আর কি !

বললাম, "পাগলামি এখন রাখো। এই উঠতি রোদে লোকজন কেউ বাইরে নেই ! চলো, পাশের গ্রামে গিয়ে ঢুকি। বিশ্রামও হবে আর পথের হদীসও মিলবে। ডাকের বচন রয়েছে, 'তাগদা

যাবি তো পাক দা যা'। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চাস তো ভালো পথ দেখে শুনে ঘুরেই যা।"

ব্রহ্ম তবু বলে, "দাঁড়াওনা, সবে ত এই একবার ডাকলাম। এমনি আরও দুবার ডাকতে হবে। কথায় বলে বার বার তিন বার। তখন যদি কেউ সাড়া না দেয় তাহলে তোমরা গিয়ে গ্রামে ঢুকো।"

ওর ওই রকমের খেয়াল। সারা বীরভূমটা পায়ে হেঁটে বেড়াবার ইচ্ছে ছিল ওকে নিয়ে। সঙ্গী ভালো। বন্ধুজনের নানা সদগুণ ওর আছে। একটা বড় গুণ এই যে ও কখনও কোনো অবস্থায়ই রাগ করেনা। ছবি আঁকতে পারে খুব ভালো, কবিতাও লিখতে পারে। কিন্তু ওর ওই কল্পনা বিলাসের পাগলামির জন্য এক একবার মন বলে, আর কখনও ওর সঙ্গে না বেরই। ওর এক বুলি আছে, "তোমরা ভাবো চোখের দেখাতেই যা আছে তাই শুধু আছে। আরে তোমরা তো জানোনা যে আকাশে বাতাসে অশরীরী আত্মারা ভেসে বেড়ায়। বিপদাপন্ন পথিককে ওরাই ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।"

আমরা বলি, "প্রমাণ একটা কিছু না পেলে কি করে তোমার কথায় বিশ্বাস করি?"

সঙ্গে সঙ্গেই ও আবার ডাক ছাড়ে, "কে আছ ভাই, পথটা দাও না বলে?"

একটু চুপ থেকে আবার, "আমরা কি তাহলে সোজাই চলব সমুখের দিকে?"

আকাশ বাতাস দিগন্ত কাঁপিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা শব্দ হল,

"হ্যাঁ...া...া...া...া.........."

স্পষ্ট শুনতে পাই আমিও। তাকাই সিদ্ধবাবার মুখের দিকে। সে আমাকে শুধায় অবাক হয়ে, "শুনতে পেলে তুমিও?"

"হ্যাঁ, একেবারে স্পষ্ট। কানে লেগে আছে এখনও।"

ব্রহ্মচারী বলল, "তাহলে আবার দাঁড়িয়ে ভাবছ কি এখনও ? পা বাড়াও সমুখে !"

কানে শুনেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। সত্যই এরই নাম কি দৈব বাণী। এমন বাণী জীবনে এই প্রথম শুনতে পেলাম। মনে মনে ভাবলাম, আমাদের সঙ্গী এই বোকা ব্রহ্মচারীটি মনুষ্য না দেবতা !

তারপরও আবার বলি, "আমার কি মনে হয় জানো, এই আখ ক্ষেতের ভিতর কোনো চাষী এই 'হ্যাঁ'-টা ছেড়েছে !"

আমার কথায় ব্রহ্মচারীর মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল।

সিদ্ধবাবা বলে, "তর্কাতর্কি না করে ঢুকে পড়লেই হয় আখ ক্ষেতের ভিতর। খুঁজে দেখে নিলেই ত ল্যাঠা চুকে যায়—ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে কি না !"

ব্রহ্মচারী বলে, "বেশ ত, দেখোই না ঢুকে। ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? যা করবার তাড়াতাড়ি করো। দেরি হয়ে যাবে শেষকালে। বেলা কম হয়নি।"

বলি, "মাথা খারাপ হয়েছে তোমার ! এই ভাপ্‌সাতে ভিতরে ঢুকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে যে !"

ব্রহ্মচারী হেসে বলে, "তুমিইত এই একটু আগে বললে যে এর ভিতরে লোক রয়েছে। আবার তুমিই বলছ এর ভিতরে ঢুকলে মারা যাবে !"

বলি, "আখ ক্ষেতে না ঢুকেই বোঝা যেতে পারে এর ভিতরে লোক আছে কিনা।"

"কেমন করে বুঝবে ?"

"মট মট করে কতগুলো আখের গাছ ভাঙতে থাকো, তাহলেই দেখবে খেতের মালিক ছুটে আসছে !"

ব্রহ্মচারী বলে, "কেন মিছেমিছি ক্ষতি করব গেরস্থর। আমরা ত বাঁদর নই। আমরা ত হনুমান নই যে, চাষীর ফসল নষ্ট করে আনন্দ পাব।"

বললাম, "আনন্দের কথা হচ্ছেনা। একটা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এ করতে হচ্ছে।"

"না। কারও ক্ষতি না করে যদি মীমাংসা করতে পারো ত করো। তা না হলে পাগলামি ছেড়ে দিয়ে চলো এগিয়ে যাই সম্মুখে।"

বলি, "হ্যাঁ, ক্ষতি না করেও কাজ উদ্ধার হতে পারে।"

"চটপট বাৎলাও তাহলে উপায়টা।"

বলি, "ছাতা দিয়ে এমন ভাবে গাছের বাইরে বাইরে এমনভাবে পেটাপেটি করতে থাকো যাতে মনে হবে যে আখের গাছই ভাঙছে কেউ। আখের পাতা ধরে নাড়াচাড়া দিলেও এমনি শব্দ উঠবে। সে শব্দ শুনে ভিতরে লোক থাকলে ঠিক বেরিয়ে আসবে।"

সিদ্ধবাবা তাই করলো। আখ খেতের চারপাশ ঘুরে ঘুরে কত এলোমেলো শব্দ, পাতার খসখসানি, জোরে জোরে পা ফেলে কত ছুটোছুটি করল কেউ বেরিয়ে এলোনা ভিতর থেকে।

ব্রহ্মচারী বলল, "তোমাদের মতো অবিশ্বাসীদের দুর্গতি ছাড়া সুগতি হবে না। চলছ তীর্থপরিক্রমায় আর মাথায় রেখেছ যত বাজে বুদ্ধি। কথায় বলে বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ! কেন বলো দেখি এই সময়টা শুধু শুধু নষ্ট করলে!"

বললাম, "সময় নষ্ট করে এমন সাধ্যি মানুষের নেই। সময়ই মানুষকে নষ্ট করে। তা নইলে এই সময়ে আমাদের মনে এই সন্দেহই বা জাগবে কেন বলো!"

ব্রহ্মচারী বলল, "সে যাহোক, স্বীকার করলে ত শেষ পর্যন্ত!"

"কি স্বীকার করলাম আবার?"

"কেন, এই যে শুনলে দৈববাণী! অশরীরী আত্মারও যে অস্তিত্ব আছে, প্রমাণ পেলে ত তার?"

"কি জানি বাবা! তোমার কত রকমের বুজরুগিই আছে!"

ব্রহ্মচারী বলে, "যার কপালে থাকেনা, তার মনেও আসেনা।

তা না হলে এমন জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ পেয়েও মানুষ আবার এ রকম ছেলেখেলা করে!"

বললাম, "দায়ে পড়েছি যখন স্বীকার না করে উপায় কি? তবু ভিতরে যদি আমার খুঁৎখুঁৎ থেকে যায় সে কি আমার দোষ! লোকজন ভিতরে থেকেও হয়ত আমাদের কথাবার্তা শুনেই চুপ করে আছে। নিজের ক্ষতি স্বীকার করে উপভোগ করতে আমাদের নির্বুদ্ধিতা।"

ব্রহ্মচারী বলল, "তবুও বলছ নির্বুদ্ধিতা?"

বললাম, "তা নয়ত কি? বুদ্ধির নাগালে এলে ত বাইরে ভিতরে মানুষ চুপ করে যাবে। ক্ষিদে পেলে শিশু কাঁদে। যতক্ষণ না মা কিছু তার মুখে দিচ্ছে ততক্ষণ শিশু কাঁদতেই থাকে। কাঁদলে তার গলার স্বর ভেঙে যাবে, পাড়ার লোকে মন্দ বলবে—ও সব কথা সে কি ভাবে কখনও! খাবার খেয়ে যখন ক্ষিদেটা মেটে তখন সে আপনা থেকেই থেমে যায়! আমারও প্রশ্নের উত্তরটা ঠিক ঠিক হলে আমি আপনা থেকেই থেমে যাই। এটা একটা রহস্যের মতো হয়ে আছে কিনা!"

সিদ্ধবাবা বললে, "অত কথার তুবড়ি ছুটিওনা বাবা। নীরবে পথ চলো। কথা বেশি বললে, কথার দিকে মন যাবে, পথের সৌন্দর্য কিছুই দেখতে পাবে না! তারাপীঠে আমরা যাচ্ছি এ কথা ঠিক। কিন্তু যে পথ দিয়ে যাচ্ছি সেটাকেও তো বাদ দিতে পারিনে। চোখ বুজে পথ হেঁটে লাভ কি!"

বলি, "চোখ বুজে বুঝি পথ হাঁটা যায়!"

"তা অবশ্য যায়না, তবে শুধু পথের রেখাটুকু দেখবার জন্য ত বিধাতা চোখ দেননি, চারপাশের জগৎটাও চোখ থেকে বাদ না পড়ে —সে কথাও তাঁর মনে বোধ করি ছিল! তুমিই ত একটু আগে বললে, খাবার পেলে শিশু চুপ করে যায়। কিন্তু শিশু যখন খায় তখন সে কি কথা বলে?"

"তা বলবে কেন। একসঙ্গে ত দুটো কাজ হতে পারে না।"

"তেমনি পথ চলা আর কথা বলাও একসঙ্গে হতে পারে না।"

"সে আমি মানিনে। এত পথ তো চলে এলাম। কথা বন্ধ ছিল কি?"

"কথা যেমন বন্ধ ছিলনা, তেমনি পথ চলাও পথচলার মতো হয়নি। শুধু দায় সারা হয়েছে। পথচলা তাকেই বলি পথ চলতে চলতে দু পাশের ছবি দেখে মন যখন আনন্দে ডুবসাঁতার কেটে এগোয়, আর আপনা থেকে মৌন হয় মুখ।"

সিদ্ধবাবা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। হঠাৎ বলে উঠল, "কি যে তোদের হয়েছে বুঝিনে। পথ চলবে একটু গল্পগুজব কর, না তত্ত্বকথার সভা সঙ্গে করে নিয়ে যেন চলছ তোমরা। এ সব রেখে দাওনা কোনো একটা ডিবেটিং ক্লাসের জন্য।"

বলি, "কথা কি কেউ জোর করে বলতে পারে, না বলাতে পারে। যখন যেটি আসবার ঠিক সেটিই আসবে। জোর করে কথা বন্ধ যারা করে তাদের মনের অসুখ হয়। সে অসুখ যাদের একবার ধরে তাদের আর ছাড়েনা। একেবারে কবরে পৌঁছে দিয়ে আসে। তা যদি না হবে তাহলে মানুষ ঝগড়া করেও শান্তি পায় কেন বলো!"

ব্রহ্মচারী বলে, "জীবনে পরম সত্যকে পেতে হলে মানুষকে মৌনব্রত অবলম্বন করতেই হয়। সত্যকে পেতে হলে মানুষকে সত্যবাদী হতেই হয়। সত্যবাদী হতে হলে কথা যত কম বলা যায়, ততই সেটা সহজ হয়ে আসে। কথায় আছে না—যে কহে বিস্তর মিছা কহে সে বিস্তর।"

পাঁচ

রোদ উঠেছে ভীষণ কড়া রোদ। ক্ষেতের আলের মাটি গরম। পায়ের তলা জ্বলছে আমার। আলে ঘাস নেই। ক্ষেতের কাদামাটি তুলে রেখেছিল আলের উপর। রোদে শুকিয়ে সে হয়েছে শক্ত ঝামার মতো। তবু আমিই চলি এগিয়ে সবার আগে। ওরা দুজন পিছনে পড়ে যায় বারে বারে! কিছু দূর এসেই ফিরে তাকাই আর ডাকি, "জোরে চলো হে, জোরে চলো!"

এই উঁচু এই নীচু। এবার আবার শুরু হয়েছে জলকাদার পর্ব। ক্ষেতে ক্ষেতে নূতন ধানের গাছ আর আল ভরা শুধু জল। কেন বলছি, আল উঁচু নয়। জমিতে জল নেই, আলেতে আছে!

নিশ্চয়ই উঁচু ছিল। তা না হলে আর আল করবে কেন! কিন্তু মানুষ সব সময় যদি আলের উপর দিয়ে চলে তাহলে আলের কাদামাটি পায়ের চাপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে দু'পাশে। এমনি ছড়াতে ছড়াতে এক সময় আলের মাটির আর কোন চিহ্নই থাকে না। ক্ষেতের জল তখন সে জায়গা দখল করে।

দেখা যায় জমিটা বেশ শুকনো, কিন্তু আলেতে জল। এই জল থেকে বাঁচবে বলে পথিকরা পথ করেছে ক্ষেতের ভিতর দিয়ে। একজনের পায়ের ছাপ ক্ষেতের উপর পড়লেই হল। তারপর যে এই পথে আসবে ঐ পায়ের চিহ্নই তাকে ক্ষেতের ভিতরে টানবে। এর এমনি আকর্ষণ শক্তি যে একবার ভেবেও দেখবেনা যে ক্ষেতের ভিতর দিয়ে গেলে চাষীর ফসল নষ্ট হবে।

ক্ষেতের মালিক ত আর ক্ষেতের আলে দিন রাত বসে

থাকতে পারেনা। কখন কে যায় সে কি করে দেখবে! যদি কখনও দেখতে পায় যে তার এত পরিশ্রম করে রোয়া ধান-গাছগুলো পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে কেউ যাচ্ছে তাহলে চাষীর মাথা কি ঠিক থাকবে!

চাষীরা পথিকের দেখা সব সময় পায়না। কিন্তু তাদের কীর্তি চাষীরা দেখতে পায় পরেও। তাই তারা পথিকদের বন্ধ করবার ব্যবস্থাও করে রাখে।

এই একটু শুকনো এই আবার জল কাদা। সঙ্গীরা এই জুতো খোলে এই আবার পরে। পায়ে যখন পরা চলেনা তখন ওঠে হাতে। বার বার খোলা আর পরা—ভীষণ বিরক্তিকর ব্যাপার। কাদামাটি রোদে গরম—মনে হয় টিনের ঘরের চালে চড়েছি, না, না, গরমজলে পা ডুবিয়েছি, ঠিক তাওনা, যেন মচকে যাওয়া পায়ে হলুদগরমের ছ্যাঁকা লাগিয়েছি। কিন্তু সে ছ্যাঁকাতে আরাম পাওয়া যায়, সেটা যে ব্যথার উপর। পথের মধ্যে পথের তাপ ঠিক সে তাপের মতো নয়!

শুকনো মাটিও ঠাণ্ডা নয়। পায়ের তলায় যেন ফোস্কা পড়ে যায়। সামনে এত পথ দেখে একবার তো ভয়ই জাগে—কি করে পাড়ি দেওয়া যাবে, যদি পা অচল হয়! কাদাজলে ভরা ধান ক্ষেতে তো আর কোনো গাড়ি ঠেলে নেওয়া যাবে না!

খালি পায়ে হাঁটা যাদের অভ্যেস নেই তারা এক পাও জুতো ছাড়া চলতে পারবেনা। কাজেই জুতো যে কিছুক্ষণের জন্য ঝেড়েমুছে থলিতে তুলে রাখবে—সে উপায়ও নেই। না পারা যায় ছাড়তে, না পারা যায় রাখতে—এমনই উভয়সংকট অবস্থায় পড়েছে আমার সঙ্গী সিদ্ধবাবা আর ব্রহ্মচারী। পায়ে কষ্ট আমারও হচ্ছে, তবে ওদের প্রতি চ্যালেঞ্জটা অটুট থাকে সেজন্য ব্যথার কথা প্রকাশ করছিনে।

হয়তো সমুখের আলটি শুকনোই আছে, কিন্তু তাতে পা

দিয়েছি কি হুল ফুটিয়ে দিল কিসে যেন। এক বিঘৎ পাশে সরিয়ে পাটা আবার ফেলতে ঠিক একই হুল। শিঙি মাছে কাঁটা মারেনি ত!

কাঁটা সমেত কুলের একটি ছোট্ট ডাল উঠে এল পায়ের তলায় লেগে। এমনি ডাল কত কে জানে ধান ক্ষেতের আলে আলে! কাঁটার খোঁচার যন্ত্রণা হচ্ছে আর সেই যন্ত্রণা থেকে অভিসম্পাত বেরচ্ছে মুখ দিয়ে জমির মালিকের উদ্দেশে। ব্যাটা এমনি নির্মম। এমন করে ছল করে পথিককে শাস্তি দিয়ে লাভ কি! ক্ষেতের কোণায় নোটিশ লটকে দিলেই হয়—"ভাই এই জমির উপর দিয়ে যেয়োনা তোমরা কেউ!"

কিন্তু মানুষ কি মানুষের নিষেধ মেনে কখনও চলতে পারে!

সোজা পথে এগনো চলেনা। হয় ডান দিকে, নয় বাঁ দিকে চলতে হয় খানিকক্ষণ তারপর যতক্ষণ না সমুখের আলপথ পাওয়া যায় ততক্ষণ হাঁটতে হয় ফালতু হাঁটা।

বার বার ঘুরে ঘুরে, বার বার অদৃশ্য কাঁটার খোঁচা খেয়ে মন বলে, এর চাইতে যে শড়কের পথ ছিল ঢের ভালো। কিন্তু শড়ক-পথ কি তেমন আছে তারাপীঠের দিকে?

কে একজন যেন বলেছিল, "আছে, তবে সে পথে পথ অনেক বেশি। পীঠে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যায়। মায়ের পুজোর প্রসাদ গিয়ে পাওয়া যায়না।" কিন্তু আমরা তো আর প্রসাদের লোভে যাচ্ছিনে। হায়রে, এখন কি সে পথটা ধরা যায় না!

ব্রহ্মচারীকে ডেকে বলি, "এখন কি সে পথটা ধরা যায়না! আমার খালি পায়ে যেমন কষ্ট, জুতো নিয়ে তোমাদের তেমনি কষ্ট। জলে কাদায় তো আর জুতো চলেনা সব সময়!"

ব্রহ্ম বলে, "এই ঘর থেকে দু পা ফেলেছ সবে, বেরিয়েছ তীর্থের নাম করে, এ টুকু কষ্ট যদি সইতে না পারো, তাহলে

বাড়ি ফিরে যাও বাপু! তীর্থপরিক্রমায় কষ্ট না করলে কোনো পুণ্যি নেই—সে জানো ত!"

বললাম, "আমি তো আর পুণ্যি করতে বেরইনি! একটু হাঁটতে, নানা রকমের জায়গা আর লোকজন দেখতে বেরিয়েছি।"

"লোকজন ত তোমার বাড়ির সামনের পথ দিয়ে সারা দিনরাত যাতায়াত করছে, ওখানে বসে, ঘরের জানলা থেকে চোখ গলিয়েই ত দেখতে পেতে। তবে হ্যাঁ, জায়গা দেখা হত না বটে। কিন্তু যেতে তো পারো ট্রেনে করে, প্লেনে করে, হিল্লী দিল্লী ঘুরে আসতে পারো। তারাপীঠের শ্মশানের পোড়া কাঠ দেখতে আর ক জন যায়! দেশ জুড়ে কত নূতন নূতন বাড়ি ঘর, আপিস, কারখানা, জলের বাঁধ তৈরি হয়েছে, হচ্ছে, সেগুলো দেখতে গেলেই পারো!"

"তোমার বুঝি সেগুলো দেখতে ইচ্ছে করে না?"

"তা করবে না কেন? তবে কষ্ট করে যেটা দেখবার সেটাকেও তো বাদ দিতে পারিনে। বামাক্ষ্যপা তো একটা যে-সে মানুষ ছিল না!"

পিছন দিকে মাঝে মাঝে তাকাই। সেই আখের ক্ষেতটা আর দেখা যায় না। মিলিয়ে গেছে দূরে দিগন্তে। যাকে পিছনে ফেলে আসা যায় সেও পিছন দিকেই ছুটে চলে।

কোনো লোকজনও চলেনা এই পথে। অথচ পায়ের চিহ্ন দেখতে পাই। কখনও যদি সন্দেহ হয় যে ভুল পথে এসেছি—তাহলে সে সন্দেহ দূর করি পায়ের চিহ্নগুলি মনে গেঁথে নিয়ে।

একটা জলস্রোত পড়ল পথের মাঝখানে। নদী নয়, তবু বেগ রয়েছে স্রোতে। কুয়োর মতো খাড়া পাড়। ওটা পার হয়ে ও-পাড়ে উঠব কেমন করে? কোথাও কোনো পথ কাটা নেই একেবারে।

বড় বেশি আঁকাবাঁকা। যেন অষ্টাবক্র মুনি খালের রূপ

নিয়েছেন। পাড় বেয়ে এক পাশে এগিয়ে যাই—পাড়ি দেবার মতো একটা জায়গা খুঁজে চলি কিন্তু পাইনে কিছুতেই।

গতির কি তাহলে এখানেই ইতি? ফিরে যেতে হবে নাকি!

"না। না। ফিরে যাবে কেন? ফিরে যে যাবে, তোমরা কি এসেছ নিজের শক্তিতে?" ব্রহ্ম বলে, "তারা মা স্বয়ং আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর কোলে।"

ভাবি, কূলে না অকূলে!

ব্রহ্ম বলে, "সংসারেও মাঝে মাঝে এমনি করে মানুষ আটকে যায় খেয়া পারে এসে। কোনো দিকে পথ দেখতে পায়না আর। এমনি নদীর ধার বেয়ে বেয়ে চলে—কিন্তু পাড়ি দেওয়া হয়না। কাণ্ডারীকে ডাকলে তবে তিনি পার করে দেন। বলে ব্রহ্ম গান ধরল,

তোরা যে যাবি পারে
কাণ্ডারীকে ডাকবি যদি আয়…"

বলি, "গানটা সদ্য রচনা করলে নাকি হে!"

সিদ্ধবাবা বলে, "তাহলে উপায়? এ পারেই থেকে যেতে হয় না কি?"

ব্রহ্ম বলে, "তা কেন হবে? কাণ্ডারীকে ডাকো! এই নদীর কাণ্ডারী আজ আর কেউ নন। আমাদের তারা মা। মায়ের নাম নিয়ে ঝাঁপ দিতে হয় চোখ বুজে! সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় তাঁর উপর। তবে দেখা যায় যে যেখানে ছিল ডুব জল, সেখানে আর হাঁটুও ডোবে না। জানোনা, সে এক ভারী মজার গল্প আছে—হরি নাম নিয়ে নদী পার হওয়ার গল্প!"

আমাদের সম্মতি না নিয়েই ব্রহ্ম শুরু করল, "এক ছিল গয়লানী। গ্রামান্তরে গিয়ে সে দুধ বেচত। মাঝখানে ছিল খেয়া পার হওয়ার হাঙ্গাম। ও পারের এক কথক ঠাকুরের বাড়িতে গয়লানী দুধ দিত। রোজ দুধ দিতে দেরি হত। কথক ঠাকুর চটে যেতেন।

গয়লানীকে ধমকাতেন। গয়লানী বলত, বাবা, আমি বাড়ি থেকে রাত না পোহাতে বেরই বাবা, কিন্তু পথে খেয়া পার হতে পারিনে। মাঝি ব্যাটা ডাকলেও শোনেনা, নদীপারে বসে বসে আমার বেলা হয়ে যায়। অনেক বেলায় মাঝি ওঠে যখন তখন তোমার কাছে আসি। তাই দেরি হয়ে যায়। কথক ঠাকুর গয়লানীর কথায় চুপ করে যেতেন। আর একদিন হয়েছে কি গয়লানী পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখে এক জায়গায় অনেক লোক জড়ো হয়ে কি যেন শুনছে। গয়লানীও দাঁড়িয়ে গেল। সে শুনল যে একজন বুড়ো লোক নামাবলী গায়ে দিয়ে হরিগুণ গান করছেন। বুড়ির বড় ভালো লাগল। সে শুনতে পেল কথক ঠাকুরের মুখের বাণী, শুধু একবার হরিনাম করলেই ভবসাগর পাড়ি দেওয়া যায়। শুধু একবার হরিনাম…

গয়লানী আর সেখানে দাঁড়ালনা। তার কি জানি মনে হল, একবার হরিনাম করলে যদি ভবসাগরও পাড়ি দেওয়া যায় তাহলে আমাদের ঐ ছোট্ট নদীটা পার হওয়া যাবেনা কেন! হায় হায়রে, এতদিন যদি এই কথাটা কেউ আমাকে বলত!

এবার নদীর ধারে গিয়ে গয়লানী আর খেয়া ডিঙির অপেক্ষা করলনা। হরি হরি বলে জলে নামল। দেখতে না দেখতে ওপারে গিয়ে উঠল।

পরের দিন কথকঠাকুর ঘুম থেকে না উঠতেই গয়লানী দুধ নিয়ে এসে হাজির। কথক এতে খুশি হলেন আবার বিরক্তও হলেন, গয়লানীকে ধমক লাগিয়ে বললেন, এতদিন ফাঁকি দিচ্ছিলে কেন? বলছিলে যে মাঝির ঘুম ভাঙেনা! গয়লানী বলল, বাবা, এখন ত আর ডিঙি লাগেনা পেরতে। হরিনাম নিয়ে পার হয়ে আসি!"

এই পর্যন্ত শুনতেই পুরো গল্পটা আমারও মনে পড়ে গেল।

বললাম, "থাক্ থাক্ আর বলতে হবে না। সে হরিও নেই আর সে গয়লানীও নেই। ও সব কথা বলে আর লাভ কি!"

ব্রহ্মচারী বলে, "লাভ আছে বলেই বলছি। তোমরাও গয়লানীর মতো বিশ্বাস নিয়ে জলে ঝাঁপ দিতে যদি পারো তাহলে দেখবে যে নদীর ওপারে গিয়ে পৌঁছেছ!"

বলি, "তুমি আগে ঝাঁপটা দিয়ে দেখাও না!"

সিদ্ধবাবা বলে, "কিন্তু এখানে হরি চলবেনা। 'তারা' বলে ঝাঁপ দিতে হবে।"

ব্রহ্মচারী আপত্তি না করে বলল, "হ্যাঁ, তাই বলো দিকি—তারা, তারা, আর হাঁটা নয়, দাঁড়াও এখানে, হাত জোড় করে নাও, আর চোখ বোজো!"

ছয়

পথ চলতে চলতে কোনো সঙ্গী এ ধরনের কাণ্ড করতে কখনও কেউ শুনেছেন! ওযে বলছে এই করো ওই করো, এগুলো কিন্তু ঠাট্টা নয়, সত্যি সত্যি ওরকম করতে হবে, তা হলে ও সত্যাগ্রহ করে বসে থাকবে ওই মাঠেই! আপনারা ভাবছেন ওকে ছেড়ে চলে গেলে ও একা ভয় পাবে? মোটেই না। আর তা ছাড়া এ সব বিষয়ে কারও কাছে পরে কোনোদিন গল্পও করবেনা। ও খুব ভালো মানুষ। কিন্তু ওকে নিয়ে মুশকিলে পড়ি যখন ওর পাগলামি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তখন চটে মটে কত কি ওকে বলে ফেলি। কিন্তু পরে বড় অনুতাপ হয়। অনেকদিন একসঙ্গে চলতে চলতে এখন অনেকটা সংযত হয়ে এসেছে আমার মুখ। তাই কখনও কখনও চুপ করেও থাকতে পারি।

ওর হাত জোড় হল। ওর চোখ বন্ধ হল। তারপর আমিও তাই করলাম। সিদ্ধবাবার কথা জানিনে।

কিছুক্ষণ এ ভাবেই কাটল।

প্রথমে চোখ খুলল ব্রহ্মচারী। উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল একেবারে, "দেখলে ত!"

আমি বলি, "কী দেখলাম এমন!"

ডান হাতের তর্জনী সম্মুখে বাড়িয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, "ঐ যে দুটো বড় বড় মাটির চাঙড় ধসে পড়ে আছে!"

"পড়ে আছে তো পড়ে আছে, কি হয়েছে এমন তাতে!"

হেসে উঠল ব্রহ্মচারী। বলল, "সেও বুঝতে পারলেনা? ওই চাঙড়গুলো ধরে ধরে আমরা এখন ও পারে উঠে যেতে পারব।"

তাইতো! ঠিকই ত বলছে ও! বললাম, "ওগুলো কি আগে ছিলনা?"

"দেখো ভেবে দেখো নিজের মনে। ভালো করে খুঁজে দেখো!"

"ছিল হয়ত, আমরা লক্ষ্য করিনি।"

"যদি ছিল তাহলে কি করে পার হব এসব প্রশ্ন উঠেছিল কেন?"

ভাবি, হয়ত ছিলনা। কিন্তু ব্রহ্মর চোখ বোজার ফলে কি চাঙড় দুটো খসে পড়ল? নদীর পাড়ের মাটি অনেক সময় অনেক দূর অবধি ফাটল ধরে থাকে। ফাটল বড় হতে হতে দেখতে না দেখতে নদীর বুকে ভেঙে পড়ে। এ তো কিছুই নয়—ছোট্টো দুটো ঢেলা। ধসে পড়া বলতে হয় তো বলা যায় পদ্মার পাড়ের মাটিকে। স্টিমারে করে যেতে যেতে কত বার দেখেছি লোকজন ছুটোছুটি লাগিয়েছে। স্টিমারসুদ্ধ লোক উৎসুক হয়ে তাকিয়ে দেখছে যে একটা বাড়ি পদ্মা গ্রাস করছে হঠাৎ—অকস্মাৎ। আধঘণ্টা আগেও তারা বুঝতে পারেনি যে এত দূর অবধি পদ্মা হাত বাড়াবে!

সিদ্ধবাবা বলল, "দাঁড়িয়ে আছ কেন আর। নাবো নদীর জলে। ব্রহ্মার প্রার্থনায় আমাদের জন্য ওপারে উঠবার সিঁড়ি তৈরি করে দিলেন ভগবান, আই মিন, মা তারা, জয় মা তারা, জয় মা তারা!"

বললাম, "ব্রহ্মর প্রার্থনায় হোক আর যে কারণেই হোক, এ ঢেলা দুটো ধসে না পড়লে সত্যি কিন্তু ওপারে ওঠা যেতোনা। খালের ধারটা যেখানে জল ছুঁয়েছে সেখানে একেবারে ৯০ ডিগ্রিতে খাড়াই কাটা মাটি। ওই ঢেলাটা সেই খাড়াইটাকে ব্রেক করেছে যে করে হোক। জলে নামবার অসুবিধে থাকলেও নামা যায়, কিন্তু ওঠবার বেলা পাড় যদি এতটুকুও তেরছা না হয় তাহলে ওঠা চলেনা। এতক্ষণ যে ভয় হয়েছিল সেটাতো কাটল।

আমরা নেমে পড়লাম। জল বেশি নয়। তা ছাড়া নদী বললেও এ পূর্ববঙ্গের খালের চাইতেও কম চওড়া। এই নামলাম আর এই উঠলাম। এত সহজ হতনা ব্যাপারটা যদি ওই চাঙড় দুটো হঠাৎ আমাদের জন্য খসে না পড়ত।

চুপচাপ পথ চলছি। কিন্তু মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন সব সময় জাগছে। যখনই একটা কিছু সংকট দেখা দিচ্ছে, সেটা ঠিক কেটেও যাচ্ছে। ব্রহ্ম যে বলে অলৌকিক কিছু আছে সেকি সত্যি!

পরক্ষণেই মনটাকে ঝাড়া দিয়ে বলি, মন, এ তোমার দুর্বলতা। নিছক দুর্বলতা। নিয়মের রাজত্বে কোনো রকমের অনিয়ম প্রশ্রয় পাবেনা। পেতে পারেনা। এ কথাই ঠিক যেন।

ব্রহ্মচারী বলে, "এ আবার কি কষ্ট!" কথাটা হঠাৎ কেন ওর মনে হল বুঝলাম না। হতে পারে, ও মনে মনে ভেবে আসছিল পথ-কষ্টের কথাই। বলে, "তীর্থযাত্রায় আগে ছিল রীতি—একেবারে শেষ বিদায় নিয়ে বেরনোর! ফিরে আসবে কিনা সে ত কিছুই ঠিক নেই! তোমরা যাই বলো, যদি ওই চাঙড় দুটো নাও পড়ত ধসে তবু আমি ওই নদী ঠিক পার হয়ে আসতাম। এপারে উঠে আসি আর না আসি নেমে তো পড়তামই।"

বললাম, "এখন কি আর সে সুযোগ তোমার হবে না বলছ! নদী আরও পাবে সামনে। ইচ্ছে হয় তো দেখাতে পারো তোমার বীরত্ব সেখানে!"

ব্রহ্ম বলে, "আমার কথা বলছিনে। বলছি, এখন ত আর মানুষের মনের মধ্যে তীর্থস্থানের প্রতি তেমন শ্রদ্ধাভক্তি নেই। যারা আসে, নেহাৎ বাড়িঘরে সময় তাদের কাটেনা, তাই পথে পথে ঘুরে দুটো জায়গায় ঢুঁ দিয়ে একটু আনন্দ করবে বলেই আসে!"

"আর কারও না থাক তোমার নিজের থাকলেই হল। পরের কথা অত ভাবো কেন বলো দেখি!"

"পর ছাড়া মানুষ আপনকে যে খুঁজে পায়না। পরের মধ্যে মন্দ খুঁজতে খুঁজতে নিজের ভালোটুকুর দিকে দৃষ্টি ঘোরে, তবেতো মানুষ সাবধান হয় আর ঠিক পথে পা বাড়াবার চেষ্টা করে!"

বললাম, "পরের মন্দ না খুঁজে কি নিজের ভালোটুকুর সন্ধান পাওয়া যায় না?"

"যাবেনা কেন? সে ভাগ্যি কি সকলের আছে? জন্মান্তরের পুণ্যফলে লাখের মধ্যে একজনের কপালে সেই ভালোর রেখা আঁকা থাকে। মানুষ ত জন্মেছে লাখ লাখ বছরে কোটি কোটি, কিন্তু ইতিহাসের পাতা বন্ধ করলে কটা মানুষের মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে বলো দিকি!"

বললাম, "মনের ভিতরে অত না তাকিয়ে তাকাও দিকি ডানেবাঁয়ে ধানগাছগুলোর দিকে! দেখছ, কি রকম হালকা সবুজ প্রাণ নেচে নেচে উঠছে থেকে থেকে—আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে! যেন বলছে, আমরা বড় হচ্ছি তোমাদেরই জন্য। এখন দেখছ রঙ, দেখছ আমাদের নাচন হাওয়ায়, দুদিন পরে এসে দেখবে আমাদের যৌবনের ঢলঢল হাসি, আমাদের হাসিতে হাসিতে মুখ থেকে ঝরে পড়বে যত সব টুকরো টুকরো সোনা, ছড়িয়ে পড়বে সারা মাঠে। সেই সোনা বিলিয়ে বিলিয়ে আমরা লীলা সাঙ্গ করব। তোমরা আমাদের শব নিয়ে কেউ তখন কান্নাকাটি করবেনা। যা আমরা দিয়ে গেলাম, তাই নিয়ে নিজেদের সংস্কার গোছাবে। সারা বছরের খোরাক সংগ্রহ করে রাখবে। তবে তো হাসি ফুটবে তোমাদের মুখে!"

ব্রহ্ম বলল, "সে কথা কে না জানে যে অন্ন ব্রহ্ম! আর সেই অন্নের ডালি যারা নিয়ে আসছে তাদের সঙ্গে পরিচয় নেইই বা কার?"

ওর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললাম, "তোমার! তোমার পরিচয় নেই এই ধানগাছগুলির সঙ্গে। তুমি কেবল পুঁথির পাতা থেকে মুখস্থ করা কথা আওড়াও, কখনও তো বললে না আহা, ধানগাছগুলো কি সুন্দর হয়ে উঠছে, হাওয়ায় ওদের পাতা কাঁপছে ইত্যাদি!"

"সে কথা কি বলতে হয়। সে ত মনেই হচ্ছে। মুখে বলে ফেললে ত সে আনন্দটুকু নিঃশেষ হয়ে গেল। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বলে ফেলাটা রসবোদ্ধার পরিচয় নয়। এই যে এখন পথের দু পাশে যা কিছু দেখছি, সামনে পিছনে যা কিছু দেখছি, উপরে নীচে যত কিছু অনুভব করছি, সবই কি সঙ্গে সঙ্গে আহা উহু করে বলে বলে যেতে হবে নাকি! তুমি এই পুঁথিপড়া উপদেশ কোথা থেকে পেয়েছ?"

বললাম, "আমার কথাটা ঠিক তুমি বুঝতেই পারোনি।"

ব্রহ্ম বলল, "সে আমার দোষ নয়, তোমার ভাষার দোষ, বলার দোষ!"

শুনেছিলাম, এখনও আমাদের দেশে এমন কোনো কোনো সন্ন্যাসীসম্প্রদায় আছেন যাঁরা দিনের পরদিন মাসের পর মাস একটানা পায়ে হেঁটে চলেন এক তীর্থ থেকে আরেক তীর্থে। এমন তীর্থ যাত্রা করে করেই তাঁদের জীবন একদিন কখন শেষ হয়ে যায় সে কথা তাঁরাও বুঝতে পারেননা। কিন্তু আমরা যে তা কল্পনাও করতেও পারিনে। এই যে সকাল থেকে এইটুকু পথ হেঁটেছি তাতেই মনে হচ্ছে কোন দেশ ছাড়িয়ে না জানি কোন দেশে এসে পড়েছি! পা যেন আর চলছেনা। বার বার মনে হচ্ছে তারাপীঠ এত দূরে! আসলে তো তিন ক্রোশ পথ। কেউ কেউ বলে তারও কম। এই মাঠের পথে আরও। কিন্তু আমাদের মনে হছে তারাপীঠ ক্রমেই পিছনের দিকে সরে সরে যাচ্ছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কম সময় নয়। এত সময়ের

মধ্যে দু এক জায়গায় বিশ্রাম নিয়ে, গল্প করেও গন্তব্যে পৌঁছানো যাবে—মনে ত সে আশাই ছিল !

ব্রহ্মচারী এর মধ্যেই উল্লসিত হয়ে উঠে বলল, "এইত আমরা এসে গিয়েছি।"

আমার বুকে যেন একটু জল পেলাম। বললাম, "সত্যি ?"

বলল, "ঐ যে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছে !"

চোখের দৃষ্টিতে জোর দিয়ে আমিও সম্মুখে তাকাই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পাই, দুটো হাড়গিলে পাখি ধান ক্ষেত থেকে কি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। বলি ব্রহ্মকে, "মন্দিরের চূড়ায় দুটো হাড়গিলে পাখি আছে নাকি ?"

ব্রহ্ম বলে, "যার মনে যেমন, ভগবান তাকে দেখানও তেমন।"

খোঁচা দেওয়া কথায় মনে হল, তবে কি ব্রহ্ম সত্যি কথাই বলছে ? কৌতূহল আরও বেড়ে ওঠে। মন্দিরের চূড়া দেখবার জন্যই আবার তাকাই। কিন্তু দেখতে পাইনে। সেই হাড়গিলে দুটোই আমার দৃষ্টির সম্মুখে এখনও পড়ছে। তাই আবার ওকে বলি, "তোমার চোখে চশমার পুরু কাচ কিনা। তাতে বোধ হয় স্বাভাবিকের চাইতে বেশি দেখতে পাচ্ছ !"

সঙ্গে সঙ্গে চশমা খুলে নিয়ে তিড়বিড় চোখে ব্রহ্মচারী তাকিয়ে নিয়ে বলে, "চশমা ছাড়াও দেখতে পাচ্ছি যে !"

সিদ্ধবাবা বলে, "যার দেখবার চোখ আছে সে মনের ভিতরেও দেখতে পায়। মন্দিরের চূড়ো কি শুধু তারাপীঠে থাকে ?"

সামনে জমি ক্রমে নীচু হয়ে আবার উঁচুতে অনেক উঁচুতে গিয়ে মিশেছে যেখানে সেই দিগন্তে দেখা যায় দু চারটে ঢেউটিনের চালামতো। ব্রহ্ম কি ও গুলোকেই বলছে মন্দিরের চূড়ো !

মনে মনে ভাবি, সিদ্ধবাবাও দেখেছে নাকি কিছু ? আমিই শুধু হতভাগ্য ? চোখ থেকেও দেখতে পেলামনা ! মনের এ সব ভাব দুর্বলতা ছাড়া কিছুনা সে কথা বুঝি, ভালো করেই বুঝি।

কিন্তু সব সময় সে বোঝাটা অটল হয়ে এক জায়গায় থাকেনা। মনটা একটা অদ্ভুত পদার্থ। এটা কেবলই কাঁপে যেন। সেই কাঁপুনিতে কিছুতেই কিছু স্থির হয়ে থাকতে পায়না। সুন্দর কলাপাতাখানি বাতাসে দোলে তাতে ভালোই দেখায়। হঠাৎ কখন একটা ঝোড়ো হাওয়া এসে পাতাটিকে ছিঁড়ে খুঁড়ে দিয়ে যায়। মনটাও ঠিক তেমনি। মানুষের মন একদিন বোধ হয় ছিল সুন্দর কলাপাতার মতন। একবার কখন ঝোড়ো হাওয়া লেগে ছিঁড়ে খুঁড়ে সেই যে বিকল হয়েছে, এখন আর তাতে জল দূরে থাক হাওয়াও স্থির হয়ে থাকে না।

সাত

এখন আর জল নেই কাদা নেই। তবে মাটি নরম। ক্ষেতের আল বেয়েই চলছি এখনও। তারাপীঠ পর্যন্তই বুঝি এরকম পথ। কিন্তু প্রতিবারে পা ফেলতেই একবার তাকাতে হয় পথের রেখায়। তা নইলে বিপদ। মরা শামুকের খোলা, আর জ্যান্ত শামুক ছড়িয়ে আছে শাদা শাদা ডিমের এক একটি ছোট্ট পাহাড়ে। সঙ্গী দুজনের এ নিয়ে মাথব্যথা নেই ; ওদের পায়ে জুতো আছে। জুতোর তলায় ওগুলো গুঁড়িয়ে যায়। ভেঙে খান খান হয়ে যায়—তারপর আমার পায়ে ঢোকবার সুবিধে হয়। আমি ওদের পিছনে পড়েছিলাম যে।

এমন করে চোখ মাটিতে দিয়ে পথ চললেই হয়েছে ! কেউ পারে নাকি ! ছুটে ওদের আগে গেলাম। তবু পায়ের তলায় শব্দ ওঠে মাঝে মাঝে মড়্ মড়্ মড়্ মড়্। মনে খচ্ করে লাগে। মরা শামুক হলে ক্ষতি নেই। জ্যান্ত হলেই ঘা লাগে প্রাণে। শামুকের প্রাণে আর আমার প্রাণে তফাৎটা কি ! প্রশ্ন জাগে। আমি কি ওকে নষ্ট করে যাচ্ছি। ওতে আমার পাপ হচ্ছে কি পুণ্য হচ্ছে ! হঠাৎ একটা অন্ধকারের ছলনায় আমাকে ভিতরে ভিতরে পাগল করে তোলে। পা চলেনা। সঙ্গীরা পিছন থেকে এসে গুঁতো লাগিয়ে বলে, "হল কি ? হাঁটছনা যে ! মায়ের কথা মনে পড়েছে নাকি ?"

এই কথা বলে যেন দিল আরও আগুন লাগিয়ে। একটা গান মনে পড়ল—সেই ছোটবেলায় শোনা,

মার কথা নেই তোর মনে···
বেলা গেছে গহীন কাননে
বলাই দাদা ও···দাদা
মার কথা নেই তোর মনে···

বেলা গেছে সন্ধ্যা হইছে রবি গেছে দূর
সুবলে ডাকিয়া বলে হারাইলাম বাছুর
বলাই দাদা ও···দাদা
মার কথা নেই তোর মনে···

গানটা গেয়েই নিলাম। তারপর বললাম, "তোমাদের পায়ে জুতো রয়েছে কিনা, তাই। জুতো না থাকলে তোমাদেরও মনে পড়ত এ সময় মাকে। দুঃখের সময় হলেই মানুষের সব চাইতে প্রিয়জনকে মনে পড়ে। ছেলেবেলায় মানুষের মায়ের চাইতে প্রিয়জন আরতো কেউ থাকে না।"

কথাটা শেষ না হতেই সিদ্ধবাবা বলল, "তুমি বুঝি এখনও ছেলেমানুষই রয়ে গেছ। এখনও মায়ের কোলটিই তোমার প্রিয়! আর কিছুর জন্যে আকাঙ্ক্ষা এখনও মনে জাগেনি তাহলে?"

ওদের কথায় মায়ের মুখ আরও জ্বলজ্বল করে উঠল আমার মনে। মাঝখানে অন্য দু একখানি মুখ যে উঁকি দেয়নি তা নয়। তবু শেষ পর্যন্ত মায়েরই জয় হল দেখলাম। মনে হল এ পর্যন্ত মা-ই দিয়েছেন সব চাইতে বেশি। মানুষের স্মৃতি মানে তাঁর দান। মানুষ নিজে কিছুই নয়। মাও যদি স্নেহশীলা না হন, তাহলে তাঁকে কোন ছেলের মনে পড়ে! মায়ের স্নেহের মধ্যেই মা বেঁচে থাকেন ছেলের দেহের সঙ্গে মনের সঙ্গে এক হয়ে! আমার মাও তাই হয়ে আছেন।

যে কথাটা চাপা দিতে চাই সেটাই মুখ দিয়ে সবার আগে বেরিয়ে পড়ে। যদিবা অনেক কষ্টে চেপেচুপে রাখা যায় তাহলে মনকে একেবারে তোলপাড় করে ছাড়ে। পথে মানুষ চলে, কিন্তু পথকে কি কেউ ভালোবাসে! ভালোবাসার বস্তুটি জেগে থাকে মনের মধ্যে সব সময়। সত্যি বলছি, এতক্ষণ হয়ত মাকে ভুলেই ছিলাম, কিন্তু যেই সঙ্গীদের মুখ থেকে বেরল 'মায়ের কথা মনে পড়েছে বুঝি' সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের মুখ আমার চোখের সামনে

ভেসে উঠল। মা নিশ্চয় দুশ্চিন্তা করবেন। বলে এসেছিলাম একদিনের মধ্যেই ফিরে যাবো। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হল তারাপীঠটাও ঘুরে যাই। খেয়ালটা ঠিক আমার হয়নি। ওদেরই হয়েছিল। বিশেষ করে ব্রহ্মচারীর। আমার বিশেষ ইচ্ছে ছিলনা। আবার অনিচ্ছাও সুবিধে করতে পারেনি। সঙ্গীছাড়া হয়ে, এক বয়সী বন্ধুদের ছেড়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে ফিরে যেতে মন চাইছিল না: তা ছাড়া এমন যাত্রায় সুযোগ চট করে যখন খুশি হয়ে ওঠেনা। সুযোগ যদি বা কখনও হয় তাহলে আবার সময় করে ওঠা যায় না। আমরা তো আর ভবঘুরে নই! পরের চাকরি করে অন্ন যোগাড় করতে হয়। সময় আর সুযোগ দুটো এক জায়গায় মিলল বলেই রয়ে গেলাম ওদের সঙ্গে। সেন মশায় আমার সংবাদ গিয়ে মাকে দেবেন এই ভেবেই নিশ্চিন্ত হতে চাইলাম। তিনি প্রবীণ, ধর্মপ্রাণ, অতিমাত্রায় সামাজিক। আমার বিশ্বাস, নিজের বাড়িতে ঢোকবার আগেই তিনি আমার বাসায় জানিয়ে যাবেন আমার মাকে যে আমি দুদিন পরে ফিরছি।

তবু মা দুশ্চিন্তা করবেন, রাত্রিবেলা তাঁর ঘুম আসবে না চোখে। কান পেতে থাকবেন—কখন দরজার কড়া নড়ে ওঠে—কখন শুনতে পান—মা, মা, আমি এসেছি! প্রিয়জনের মুখের কথা, গলার স্বর শোনবার জন্য কার না প্রাণ ছটফট করে! কত কথাই এখন পথ চলতে চলতে মনে ওঠে—এমনি তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে কত লোক সংসারে আর ফেরেনি। আমার জীবনে যদি এমন কিছু ঘটে! পথে চলতে চলতে হঠাৎ যদি একটা সাপে ছোবল মেরে দেয়। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে মনটাকে এলোমেলো করে দিতে চেষ্টা করি। তিরস্কার করি নিজেকেই—কেন এমন বাজে চিন্তা টেনে আন তুমি! অন্য রকম চিন্তাও তো টেনে আনা চলে! তারা-মায়ের মন্দিরে যাচ্ছ, বামাক্ষেপার সিদ্ধপীঠে যাচ্ছ, সে সব কথাও

বাইরে। মনে হল এত পথ আমি হেঁটে আসিনি। কে আমাকে কাঁধে চড়িয়ে এনেছে।

নদীর বুকে জলের গতি দেখছি অবাক হয়ে! কোথায় যায় এই জলস্রোত? সাগরে? তারপর? আবার বাষ্প হয়ে আকাশে? মেঘ হয়ে আবার মাটিতে ফিরে আসে। নানা উঁচু জায়গা বেয়ে বেয়ে, খালে নালায় গড়িয়ে পড়ে নদীতে? আর আমরা? কোথায় যাই? সে কোন্ সাগরে?

জবাব খুঁজে পাবার আগেই চোখে পড়ল নদীর ওপারের জঙ্গল একটা। একটা আশ্চর্য নীরবতা সেখানে! ওই জঙ্গলটা যেন কত নিঃস্ব। সংসারে কেউ তার নেই? সে বুঝি চুপচাপ বসে বসে নদীর স্রোতের ধ্বনি শোনে!

ব্রহ্ম আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাঁক ছাড়ল, "কে আছো ভাই বলে দাওনা কোন দিকে গেলে আমরা ঘাট পাবো?"

ওর হাঁকটা প্রতিধ্বনিত হল ও-পারের ওই জঙ্গলটাতে। ওখান থেকে কে যেন ওর হাঁকের শেষ কটা কথা উচ্চারণ করল: "পা বো……ও…ও…ও…ও"……

তিনজনেরই দৃষ্টি গেল জঙ্গলটার দিকে। বেশি দূরে ত নয়। নদীটা পার হলেই। এপারে এত আলো, কিন্তু জঙ্গলটাতে শুধু অন্ধকার। এখানে দিন আর ওখানে রাত্রি বলা চলে। হঠাৎ একটা থমথমে ভাব। আমরা সবাই চুপচাপ। তিনজনেই এক মন হয়ে যেন কি না কি ভাবছি!

ব্রহ্ম আবার হাঁক ছাড়ল, "বলে দাও ভাই!"

সঙ্গে সঙ্গেই ও পার থেকে প্রতিধ্বনি: "…দাও……ভা…… আ……ই…ই…ই……"

বললাম, "কেউ আছে নাকি ওই জঙ্গলটাতে?"

ব্রহ্ম বলে, "নিশ্চয়ই আছে। তা নইলে এমন সাড়া দেয়!"

বলি, "সাড়া দেয় কোথায়? এ তো প্রতিধ্বনি উঠছে তোমার

শব্দের। একেবারে খোলা মাঠে এ রকম প্রতিধ্বনি হয় না। শব্দটা কোনো কিছুতেই ধাক্কা খাওয়া চাই। এখানে ও পারে জঙ্গলটাতে ধাক্কা খেয়ে শব্দটা ফিরে আসছে, তাই আমরা শুনতে পাচ্ছি, কে যেন আমাদের কথাটাই আবার আমাদের শুনিয়ে দিচ্ছে !"

ব্রহ্ম বলে, "শুধু আমাদের কথা ফিরিয়ে দিয়েই মুক্তি পাবে বলছ ? আমাদের কথার উত্তর আদায় করে ছাড়বে !"

হেসে বলি, "অত ডুবে ডুবে শালুক মিলবেনা ভাই ! ওখানে না হয় আখের ক্ষেত ছিল, দেখতে পাওয়া যায়নি লোকটিকে। এখানে ঠিক খুঁজে বের করা যাবে। এ জঙ্গল তেমন ঠাসা নয় !"

ব্রহ্ম আবার হাঁক ছাড়ল, "কোন দিকে যাব ভাই ?"

প্রতিধ্বনি হল : "ভা···আ···ই···ই···ই···"...আবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরও হল, "দু বিঘে জমি বাঁদিকে এগিয়ে যাও কেনে······ এ···এ···"

শব্দটা শুনলাম। সিদ্ধবাবাকে বললাম, "শুনলে ত ?"

"হ্যাঁ, শুনলাম।"

বলি, "এবার লোকটাকে খুঁজে না বের করে ছাড়ছিনে।"

পাড় ধরে ধরে পাশাপাশি এগিয়ে যাচ্ছি জঙ্গলের দিকে চোখ রেখে। একটা শব্দ আসছে কানে। কুড়াল দিয়ে গাছ কাটছে—কট্‌হা···কট্‌হা···কট্‌হা....

বলি ব্রহ্মকে, "শুনলে ত ! ঐ যে লোকটা গাছ কাটছে, সে-ই কথারও উত্তর দিয়েছে !"

ব্রহ্ম বলে, "দিয়েছে দিয়েছে, কি হয়েছে ! আমরা পথ পেলেই হল। সে কাঠুরেই দিক আর যেই দিক কথার উত্তর। এ নিয়ে অত কথার কি আছে !"

বললাম, "কোনো কথা নেইই ! তুমি বুঝি একটা ভুয়ো ধারণাতে

আমাদের মনকে বেঁধে রাখবে! বলবে, দৈববাণী, অশরীরী আত্মা কত কি সব আজগুবি!"

ব্রহ্ম বলে, "বেশ, বেশ, আগে ত ওপারে পৌঁছই। তখন গিয়ে কাঠুরেকে শুধিয়ে নিলেই বুঝতে পারবে!"

আমার সকল সাহস, সকল মনের জোর ব্রহ্মের এই উত্তেজনাহীন উত্তরে একেবারে মিইয়ে গেল। ওকে কিছুক্ষণের জন্য আর কোনো কথা বলতে পারলামনা।

আট

বাঁদিকে এগিয়ে চললাম আমরা। এ নদী অষ্টাবক্রের দাদামশায়। এতে বাঁকের আর সংখ্যা নেই। সিকিমাইল পথ হেঁটে যেখানে এলাম সে যেন একই জায়গা—মাথার চারিদিকে ঘুরিয়ে এনে ভাতের গ্রাস মুখে দেওয়ার মতো। এত কাছে অথচ মোটে দেখতে পাইনি যে এখানেই খেয়াঘাট রয়েছে।

উপরে পাড় থেকে নদীর জল অবধি একটা সুড়ঙ্গের মতো হয়েছে। মানুষের পায়ের চিহ্ন এখানে নেই—কীর্তি রয়েছে। উপর থেকে এটা ওটা নানা গাছের শিকড়গুলো ঝুলছে। ওগুলোকে ধরে ঝুলতে ঝুলতেই আমাদের নামতে হবে বুঝি?

মনে পড়ল জরৎকারু মুনির কথা। তিনি অকৃতদার ছিলেন বলে তাঁর পূর্বপুরুষ বিন্যা মূল ধরে ঝুলছিলেন। ওটিই শেষ অবলম্বন। অর্থাৎ জরৎকারুর লীলা অবসান হলেই তাঁর পূর্বপুরুষরা ধপাস্ করে পড়বেন মহাতলে।

আমরাও তেমনি ভাবে না পড়ে যাই, সে ব্যবস্থা করতে হবে।

বৃষ্টি হয়নি, কিছু হয়নি ত এ জায়গাটা এত পিছল হল কি করে?

ব্রহ্ম হেসে বলে, "কি যে বোকার মত এক একটা কথা তুমি এক একবার বলো!"

বলি, "কেন, বোকা হলাম আবার কেন?"

"বুঝতে পারছনা নদী থেকে লোকে উঠে আসছে, পায়ে জল লেগে লেগে আসছে। সেই জলেই পাড়ের এই পথটুকুও সপ্‌সপ্‌ করছে!"

বললাম, "নদী থেকে উঠতে পায়ে জল লাগবে কেন? খেয়া-ডিঙিতে চড়ে সবে পার হচ্ছে ত নদী?"

বলল, "তাকিয়ে গ্যাখোনা খেয়াডিঙির দিকে! ডিঙির এ মাথা থেকে ও মাথা অবধি কাদামাখা হয়ে আছে!"

"ডিঙি কোথায়। এতো দুটো তালগাছ! পাশাপাশি বেঁধে ভিতরটা খানিকটা গর্ত করে নিয়েছে! কাঠ কোথায় ওতে?"

ব্রহ্ম বলে, "এদেশে এরকমই হয়। তা ছাড়া তাল কাঠ খুব শক্ত কাঠ। এ জলে যেমন কুমীর, ডাঙায় তেমনি বাঘ। গ্যাখোনি এ দেশের ঘর তৈরি হয় তাল গাছ দিয়ে। তালের খুঁটি, তালের কড়ি, তালের বাখারি সব।"

বললাম, "শক্ত টক্ত সব বাজে কথা। আসলে অন্য কাঠ এখানে পাওয়া যায়না, আর বাঁশের তো বালাই নেই এ দেশে—তাই তালকে সম্বল করেই সবাই তাল সামলায় ঘরবাড়ির!"

জোড়া তালগাছ পারে ভিড়িয়ে বসে আছে মাঝি। আমাদের দেখেও উঠে আসছেনা কেন? ও কি রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা শোনেনি ঃ

ওগো তোরা কে যাবি পারে
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে······

কিন্তু শুধু কি বসেই থাকবে? এবার তো আমরা যাবো বলছি। তবু উঠে আসেনা কেন? হাত দিয়ে ইশারা করলাম, এসোহে খেয়াডিঙিটা এ পারে ভিড়িয়ে দাও!

ব্রহ্ম মিষ্টি সুরে চড়া গলায় ডাকল, "হে ভাই, পার করো!"

আমি বললাম, "হয়ত আমাদের কথা বুঝতে পারেনি।"

ব্রহ্ম বলে, "কেন?"

শুদ্ধ ভাষায় বলো, "ওহে কর্ণধার তরণীখানি তটস্থ করো!"

ব্রহ্ম বলে, "মাথা নেই মুণ্ডু নেই মাঝখানে এক একটা কথা কি

যে বলো তুমি ! খেয়াঘাটের মাঝির সঙ্গে এত সংস্কৃত ভাষায় কথা বলবার দরকার কি ?”

বললাম, “দরকার থাকলেই কি কেউ বলে আর না থাকলে কেউ বলে না ?”

ব্রহ্ম বলে, “না, দরকার না থাকলে কেউ বলে না।”

আমি বললাম, “বলে।”

“কে বলে ?”

“বলেছিল এক সাহেব। সদরের হাকিম ! বাংলাদেশে থেকে বাংলাভাষা শিখেছেন। একদিন সঙ্গীসাথী কাউকে না নিয়ে একা একা গ্রামে গিয়ে হাজির। একটা খাল পার হতে যখন হবে তখন কি বলে মাঝিকে ডাকবেন ? সাহেব পড়লেন ফ্যাসাদে। কিন্তু শত হলেও সাহেব ত, তা ছাড়া প্রভুর তরফ, ভয়ের কিছু নেই। মন স্থির করে বলবার কথাগুলো মনে মনে আগে ঠিক করে নিলেন। শেষে মাঝিকে ইশারা করে বললেন, “ওহে কর্ণধার, তরণীখানি তটস্থ কর !”

একটা আসল সাহেব, একেবারে শাদা চামড়া। তাকে দেখে গাঁয়ের মাঝির ত এমনি হৃৎকম্প ! সে কথা বুঝবে কি ! বুঝবার চেষ্টা না করে ডিঙি রেখে পারে উঠে পড়ল। গাঁয়ে ঢুকে সরপঞ্চকে খুঁজে আনল। ততক্ষণ ত সাহেববেচারী খালের পাড়ে দাঁড়িয়ে থেকেছিল !

তাই বলছিলাম, “তুমি যে কাব্যিক ভাষা ব্যবহার করছ তাতে মাঝির আবার মেজাজ চটে না যায় ?”

ছুটোছুটি নেই, তাড়াহুড়ো নেই, আস্তে সুস্থে মাঝি এসে এতক্ষণে উঠলো তার ডোঙায়। লগি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে ছাড়ল জলে। আবার তুলল, আবার ছাড়ল। এমনি কয়েকবার লগি ঠেলে সে থামল। ডোঙা এসে ভিড়ল এ পারে, আমাদের কাছে।

ভীষণ পিছল ডোঙার উপরটা। বসবার জায়গা কিছু নেই। সবাই বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পার হয়!”

উঠে ত দাঁড়ালাম ডোঙার উপর। মাঝখানটাতে খড়ঘাস বিছানো। শুকনো নয়, জল চপ্ চপ্ করছে তাতে। পাছে পা পিছলে কেউ পড়ে যায়, তাই বুঝি এই ব্যবস্থা। কিন্তু ছাড়ছেনা কেন। আর কার অপেক্ষা করছে?

বললাম, “ছাড়ো ভাই, মুক্তি দাও! জলে কাদায় কতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় বলো! ছাড়ো, ছেড়ে দাও!”

মাঝি তার বিরাট গোঁফজোড়াতে তা দিয়ে নিল। ঠোঁট দুখানি ফাঁক না করেই একটুখানি হাসল। ভাবখানা—তোমাদের কথায় কর্ণপাত করা আমার কর্ম নয়।

ব্রহ্মের আনন্দ আর ধরেনা। সে ডোঙার অপর মাথায় গিয়ে তোয়ালে বিছিয়ে বসে পড়ল। সে বুঝি জানত যে মাঝি অনেক দেরিতে এ পার ছাড়বে!

মাঝি অন্য যাত্রীর অপেক্ষা করছে নাকি?

বললাম, “ভাই, আর কেউ নেই। কেন মিছেমিছি দেরী করছ? ছেড়ে দাও!”

সে আবার নিশ্চিন্তে গোঁফে তা দিয়ে নিল।

আমি পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম, আর কেউ আসছে কিনা দেখতে! কিন্তু এখান থেকে দৃষ্টি নদীর পাড়ে পৌছয়না—পাড়টা অনেক উঁচুতে। কাজেই বসে পড়বার তাল করতে লাগলাম।

ব্রহ্ম বলে, “জানো, আমাদের জীবনটা ঠিক এই খেয়া ডোঙার মতো। তাতে চড়ে বসেছি, কিন্তু ও পারে আর পৌঁছতে পারছিনে। মাঝির মর্জি না হলে ত আর ও পারে যাওয়া হয়না।”

বললাম, “মাঝির উপর নির্ভর না করলেই হয়। সাঁতার দিয়ে পেরিয়ে গেলেই হয়। জীবনটাকে খেয়াডিঙি ভাবলেই এটা খেয়া-

ডিঙি। না ভাবলে জীবনটা শুধু জীবন। সব সময় মুক্ত। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারবেনা। কেউ তাকে বেঁধে রাখতে পারবেনা। সে ইচ্ছে করলে চলতে পারে। ইচ্ছে করলে বসে থাকতে পারে। জীবনের মূল কথাটা হল ইচ্ছে! ইচ্ছের জয় সর্বত্র।"

বলে. "তাই যদি তবে তুমি কেন এলে এত পথ, আবার খেয়াডিঙিতে চড়ে বসলে ইচ্ছে করলেই ত সাঁতরে যেতে পারো!"

বলি, "ইচ্ছে করিনে, তাই!"

"ইচ্ছে করতে পারো না। সে অত সহজ নয় সে কথাটা বলো। মানুষ ত মুক্ত, পুরুষ মুক্ত—সে কথা কে না জানে! তবু সে বদ্ধ হয় প্রকৃতির ফাঁদে পড়ে। ইচ্ছে করলেই সে পারে ফাঁদে পা না দিয়ে মুক্ত থাকতে। কিন্তু সে ইচ্ছে করার শক্তি সকলের থাকে না। যাঁদের থাকে তাঁদের কাছে তুনিয়ার লোক ছুটে যায়। আমরাও যাচ্ছি তেমনি একজন শক্তিমান্ পুরুষের কাছে। বুঝলে ত ব্যাপারটা!"

সত্যি সত্যি আরেকজন লোক এসে উঠল ডোঙায়। ডোঙা যে ডুবুডুবু! ওমা, এটা যে এ পারেই ডুববে দেখছি! ও মাঝি, কিগো আমাদের তুমি ডুবিয়ে মারবে নাকি!

তবু নৌকা ছাড়েনা। মাঝির দিকে তাকিয়ে দেখি সে আবার তার গোঁফে তা দিচ্ছে। মনে হয়—সংসারে এ লোকটার ভাবনা শুধু ঐ গোঁফ জোড়াটার—অন্য কিছুর চিন্তা সে করে না, ভাবনাও ভাবে না!

ওমা, এ কি, আরও একজন। আমি বললাম, না ভাই, আমি নেমে পড়ি, আমাকে নামিয়ে দাও। আমি যাবোনা ও পারে! আমি অস্থির হয়ে উঠেছি!

মাঝি ডোঙা ছেড়ে দিয়েছে এবার। টলমল টলমল করছে তাদের গাছ তুটো। এই বুঝি ডুবে যায়, এই বুঝি ডুবে যায়

করতে করতে কোনোরকমে এসে ডোঙাটা পৌঁছল এ পারে! যেটা ছিল ওপার সেই হল এখন এপার।

মাটিতে পা দিয়ে যেন গঙ্গাস্নান হল। ব্রহ্মচারী শুধালো মাঝিকে, "তিনজনের জন্য কত দিতে হবে ভাই?"

মাঝি কোনো কথাটি না বলে শুধু হাতটি বাড়িয়ে দিল।

ব্রহ্মচারী একটি দু আনি তার হাতে দিল।

মাঝি একবার গোঁফে হাত বুলিয়ে নিয়ে এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে তাকালো ব্রহ্মচারীর দিকে।

ব্রহ্ম বুঝি ঐ চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল। শুধালো, "খুশি হলে ত?"

মাঝির চেহারা আরও রহস্যময়। সে এবার তার হাত আকাশে তুলে ইশারা করে কি যেন দেখালো!

বোঝা গেল মাঝি খুশী হয়নি। চুপি চুপি ব্রহ্মকে বলি, "আরও এক আনা বের করে দাও শিগগির। এক আনার কমে বোধ হয় আজকাল চলেনা।"

ব্রহ্ম আরও এক আনা মাঝির হাতে দিল। মাঝির চোখমুখের দিকে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে রইল। আমরা একটু দূরে সরে এলাম।

ব্রহ্ম মাঝির আরও কাছাকাছি হল। কাঁধের থলিটা ফেলে দিয়ে দুটো হাত পাখীর ডানার মতো দুদিকে ছড়িয়ে মাঝিকে বলল, "এসো ভাই আলিঙ্গন করি!"

ব্রহ্মের এই গৌরাঙ্গভাব দেখে আমিও অভিভূত হয়ে পড়েছি। কত উদার তার প্রাণ। ঘাটের মাঝির সঙ্গে কোলাকুলি করছে! আমরা কি পারি এত সহজ হতে! আমাদের ভিতরে সদ্‌ভাব কখনও দেখা দিলেও বাইরে সংকোচ থেকে যায়।

মাঝি গিয়ে ডোঙায় চড়ল। যেন গ্রাহ্য করলনা ব্রহ্মের প্রেমসম্ভাষণ। মাঝির মুখে আগের সে রহস্যটুকু আর নেই।

একটা ক্রোধাভাস যেন। অন্যমনস্কভাবেই সে যেন গোঁফে চাড় দিল দু বার। তারপর চোখের তারা বড় বড় করে তাকালো ব্রহ্মচারীর দিকে। বলল, "আমি চণ্ডাল নই, ঘাটোয়াল বটি।" বলেই যে সে মুখ ফিরালো আর এ দিক তাকালোই না!

ব্রহ্মচারীকে ডাকছি, তবু সে আসছেনা। হা করে দাঁড়িয়েই আছে। একটা পানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঘাটোয়াল ও পারের দিকে ডোঙা নিয়ে এগিয়ে গেল। ভুলেও একবার আর চেয়ে দেখলনা। ব্রহ্ম যেন নিজেকে বড় অসহায় ভাবতে লাগল!

হঠাৎ বুঝি তার সম্বিৎ ফিরে পেল। ব্রহ্ম ছুটে এল আমাদের কাছে এ পারের কদমগাছ তলায়। ছোট্ট চারা গাছ। তবু ত জাতে কদম্ব। ভগবানের লীলার সঙ্গে যুক্ত এই গাছ—এ যে বহুকালের। যমুনা না হোক, এতো দ্বারকা নদী। দ্বারকার পারে কদম্বতরুর মূলে আমরা বসেছি। কি আরামই না লাগছে! কিন্তু এই চারাটি লাগিয়েছে কে? এই ঘাটোয়াল?

সে কথা শুধোবার সুযোগ আমাদের আর রইল না। ব্রহ্মচারী লোকটাকে চটিয়ে দিয়েছে। আপনারা যদি কেউ কখনও যান ঐ পথে, তাহলে শুধিয়ে আসবেন ঐ কদমগাছটা কে ওখানে বসিয়েছিল! অবশ্য তার আগে আপনারা একটু তার ছায়ায় বসে আরাম করে নেবেন!

ও পারে আরও দুজন যাত্রী—ডোঙায় চড়েছে। ঘাটোয়াল তাদের কাছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, "আজকালকার বাবুরা মনে করে, ইস্কুলে পড়েছি, কতইনা শিখে ফেলেছি, বুঝি আমাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে, ঐ দ্যাখোনা, বসেছে তিনজনা গাছতলায়।"

আমি বলি সঙ্গীদের, "ওঠো শিগগির। এখানে প্রেম বিলোতে গেলে কপাল কাটা যাবে। উঠে পড়ো। চলো পালাই মান নিয়ে।"

ডোঙায় চড়ে যারা আসছে ওরা নিশ্চয় ঘাটোয়ালের চেনাশোনা লোক। অন্তত কাথাবার্তায় তাই মনে হচ্ছে। ওরা কি তারাপীঠ অবধি যাবে ?

প্রশ্নটা মনে নিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। একটু তাড়াতাড়িই হেঁটে চললাম। বলা তো যায়না, কোন মানুষের মনে কি থাকে। একই সূর্যের আলোতে কেউ তুলসীদাসের রামায়ণ পড়ছে, কেউ গুলি ছুঁড়ছে বন্দুক থেকে!

নয়

আবার মাঠ—ধানজমি। আবার সেই আলপথ। আবার সেই আগের মতো হাঁটা। আর কথা বলা। কথায় কথায় ঘাটোয়াল আর ঘাটোয়াল। জানিনে সিদ্ধবাবা আর ব্রহ্মচারী জানে কিনা শ্রীরামচন্দ্র আর ঘাটোয়ালের কাহিনী। আমার মনে সে কাহিনীই ছবি হয়ে ভাসছিল। তবু আমি চুপ করে গিয়েছিলাম। আমার মাথায় অন্য অনেক চিন্তা এসে কিল বিল করছিল।

সিদ্ধবাবা লেগেছে ব্রহ্মচারীর পিছু এবার। বলছে, "পথেঘাটে কি সব কাণ্ড তুমি যে করে বসো! রামচন্দ্র সাজতে গিয়েছিলে, পেলে ত আক্কেলটা। জোর করে তোমাদের মহাপুরুষ হবার এই চেষ্টাটা ছাড়ো দিকি! ভিতরে ভিতরে মহাপুরুষ হতে কে তোমাদের বারণ করছে। এ সব ডেমনস্ট্রেশন দেবার দরকার কি? হৃদয়ের আবেগ চাপতে অভ্যেস করো। তা না হলে বিপদে পড়বে। মূর্খ লোকের না বোঝার বুদ্ধির সঙ্গে কোনো প্রেম দিয়েই তুমি এঁটে উঠতে পারবেনা মনে রেখো!"

বললাম, "থাক থাক, আর বকোনা ওকে। যা হবার হয়েছে। আসলে ও তো কিছু খারাপ করেনি। কাজেই ওর অনুতপ্ত হবার কিছুই নেই। তুমি অত চটলে কেন বলো ত!"

সিদ্ধ বলে, "ক্ষেত্র চাই ত! বীজ যে তুমি বুনবে, সে কি পাথরের উপর বুনলে কোন কাজ হবে, চষা ক্ষেত চাই—তাতে বীজ ছড়ালে কেউ তোমাকে মন্দ বলবেনা। কিন্তু তুমি যদি আবেগের বশে এক ধামা বীজধান নিয়ে একটা টেনিসখেলার লন এ ছড়াতে থাকো, তাহলে লোকে কি তোমাকে পাগল বলবেনা?"

বললাম, "ঠিক আছে বাবা! আর দরকার নেই। সবই ত বুঝি, কিন্তু সব সময় বুদ্ধি কি আর কারও ঠিক থাকে, প্রেম যখন বান হয়ে ছড়ায় তখন কি আর কোনটা টেনিস লন আর কোনটা চষা ক্ষেত তার হিসেব রাখে!"

সিদ্ধ বলে, "ওরা তথাকথিত অশিক্ষিত সম্প্রদায়! ওরা কোনো যুক্তি উক্তির ধার সাধারণত ধারেনা। নিজের নিজের বংশ ও সম্প্রদায়ের একটা ভুয়ো কৌলীন্য নিয়ে ওরা খোশমেজাজেই থাকে। তা না হলে বুঝতে পারোনা, ওদের মধ্যে কোনো কর্মের উদ্যম নেই, জানবার জন্য শোনবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন নেই। গতানুগতিক ধারায় যেটুকু ওরা পায়, সেটুকু নিয়েই গর্ব অনুভব করে। দেখলে না, একটা সাধারণ মাঝি তার আত্মসম্মান বোধ কত তীব্র! তুমি সমান বলে কোল দিতে গেলে, সে তা প্রত্যাখ্যান করল! শুধু তাই নয়, তোমাকে একেবারে উল্টো বুঝে বসল। তুমি ভেবেছিলে এতে করে নিজের অহংকার বিসর্জন দিলে, সে ভাবল যে তুমি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে গিয়েছ! নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সে ক্ষুণ্ণ হতে দিল না কিন্তু তোমার যেটুকু ছিল তা নিয়ে তুমি কি ফিরতে পারলে!"

ব্রহ্মচারী মাথা নিচু করে পথ চলছে। সে যেন একটু ঘাবড়েই গিয়েছে!

আমি তাকে সাহস দিয়ে বললাম, "তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত মন খারাপ করছ কেন। মনে করো গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন,

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ
বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।"

হঠাৎ ব্রহ্মচারীর মুখ ফুটল। সিদ্ধবাবাকে ডেকে বলল, "তুমি কাদের মূর্খ বলছ, তুমি কাদের অশিক্ষিত বললে?"

ব্রহ্মচারী তাহলে ওই কথাটাই ভাবছিল। এবার সিদ্ধবাবাকে জব্দ করবে!

সিদ্ধবাবা কোনো কথা বলছেনা দেখে ব্রহ্মচারী আবার শুরু করল, "ঘাটোয়াল ঠিক কথাই বলেছে। তাকে আলিঙ্গন করে যা না পেতাম, তার প্রত্যাখ্যানে তার চাইতে অনেক বেশি পেয়েছি আমি। আমার যে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান আছে তা তো আমার জানা ছিলনা, থাকলেও কি দিয়ে যেন ঢাকা ছিল, চাপা ছিল, আজ ঘাটোয়াল; তোমার সেই অশিক্ষিত মূর্খ ঘাটোয়াল আমার চোখের উপর থেকে সেই অন্ধকার ঢাকনাটি শুধু তুলে নিল। বলতে বলতে ঘাটোয়ালের উদ্দেশে দুহাত জোড় করে নমস্কার জানালো ব্রহ্মচারী।

সিদ্ধবাবা এবার আমাকে বলে, "তুমি চুপ করে রইলে যে!"

বলি, "কি আর বলব আমি! তোমাদের সকলের কথা শুনে আরেকটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল! খুব বেশি দিন আগেকার নয়, ধৈর্য থাকে ত শুনতে পারো!"

"বেশ ত বল না, বলে চলো। পথ চলার মানেই হল গল্প বলা আব গল্প শোনা। পথে যদি গল্প না চলত, তাহলে বুঝি মানুষের চলাই বন্ধ হত—কি বলো! বলো, বলো তোমার সেই ঘটনা। বলে চলো!"

"গরমের দিন। দুপুরবেলা ঢুকেছে এসে একজন আমাদের সদর ঠেলে। সঙ্গে একটা ছোট্ট মেয়ে। থেকে থেকে তার মুখ থেকে ধ্বনি উঠেছে, দেন মা একমুঠি ভিক্ষে, দেন মা একমুঠি ভিক্ষে··· একেবারে ট্রেনিং দেওয়া গলা। ছ সাত বছরের মেয়েটি। াপের সঙ্গে সঙ্গেই চলে। প্রথমে মিহি গলায় মেয়েটা ঘুম ভাঙায় লোকের। পরে পরে আবার সেই কথাটারই পুনরাবৃত্তি করে ওর বাবা, দেন···মা···এক···মু···ঠি···ভি···ক্ষে···এ···এ···

লম্বাচওড়া চেহারা। সোজাই আছে শরীরটা, বয়স চল্লিশ এর বেশি হবেনা। ইচ্ছে করলে কাজকর্ম করতে পারে! শুধালাম তাকে, 'ভিক্ষে করতে বেরিয়েছ কেন?'

'খাবো কি বাবু ?'

'কাজ করতে পারো না ?'

'ব্যামারী মানুষ বাবু, কাজ কেউ দেয়না।'

'মেয়েটাকে তো কারও বাড়িতে কাজে লাগিয়ে দিলে পারো। পেট ভরে খেতে পায়। কাজকর্ম শিখতে পারে ঘরগেরস্থালীর !'

'ওটা যে আমাকে ছাড়া থাকতে চায়না কোথাও গিয়ে বাবু !'

'ওর মা নেই ?'

'না বাবু, ওর মা নেই। তাহলে কি আমার এত দুঃখু !'

'তোমার আর ছেলেপিলে আছে ?'

'আছে বাবু।'

'ওরা কাজকর্ম করে না ?'

'করে বাবু, ওরা কি আমার খাবার জুগাইতে পারে ?'

'কেন ? কাজ করলে ত পয়সা পায় !'

'পয়সা কেউ দেয়না বাবু। ছোটো ছোটো যে ! পেটেভাতে থাকে।'

বললাম, 'তাহলে আর কি হবে ! তোমার নিজেরটা নিজেকেই করে দেখতে হবে ! যে রকমের কাজ তুমি করতে পারো তাই করোনা কেন ?'

'কি কাজ পারবো আমি বাবু ! কাজ আমাকে কেই বা দিবে ?'

'আমি যদি একটা কাজ তোমাকে যোগাড় করে দিই ?'

'কি করতে হবে, বলুন তা আগে শুনি ?'

'খুব সহজ কাজই। তুমি করতে পারবে, এমন কাজের কথাই বলছি !'

'বলুননা ?'

'বাঁশবেতের কাজ।'

'সে আবার কি রকম ?'

'এই বাঁশ থেকে বেত তৈরী করা। বেত দিয়ে ঝুড়ি, চুবড়ি,

ধামা, ইত্যাদি বানানোর কাজ। বসে বসেই করতে পারবে। এই কাজে হাঁটা নেই, ছোটা নেই। তবে প্রথম কদিন একটু দেখে নেবে, শিখে নেবে। সে তেমন কিছু শক্ত নয়!'

এতক্ষণ লোকটার মুখ কাঁচুমাচু ছিল। হঠাৎ কি রকম গম্ভীর হয়ে উঠল। ঠিক ঐ ঘাটোয়ালের মতো। চোখ দুটো যেন কি রকম অস্বাভাবিক মনে হল। সঙ্গে সঙ্গেই মুখ থেকে বেরল, 'কি সব যা তা বলছেন বাবু আমাকে; আমি কি ডোমের ছেলে যে ঝুড়ি চুবড়ি বুনতে যাবো!'

বললাম, 'ও, আচ্ছা সে যদি না করতে চাও তাহলে তাঁতের কাজ করনা! একটু কঠিন বাঁশ বেতের চাইতে। তবে একবার শিখে নিতে পারলে খুব বেশি পয়সা কামাই করতে পারবে। ওদের কখনও পথে দাঁড়াতে হবে না!'

সে আগের মতোই গম্ভীর গলায় উত্তর করল, 'আমাকে কি তাঁতী পেয়েছেন?'

বললাম আবার, 'চামড়ার কাজ করবে?'

এবার সে উঠেই পড়ল। বলল মেজাজ দেখিয়েই, 'ভিখ্ দিতে হয় দিবেন, না দিতে হয় দিবেন না। আমি খেতে না পাই তাতে আপনার কি? আমাকে আপনি মুচি হতে বলবেন কেন? গরীব বলে এত অপমান করেন?'

বলতে বলতে সে উঠে চলেই গেল।

আমি দেখছি সে চলে যাচ্ছে, কিন্তু কিছুই তাকে আর বলতে পারছিনে। কোনো কথা বলে যে তাকে আবার ফেরাবো, সে আর খুঁজেই পেলাম না। নিজে কথা বলে যেন বোকা বনে গেলাম!

ঘরে ঢুকলে মা শুধালেন, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

আমি সব কথা মাকে বললাম। মা বললেন, 'দুঃখী মানুষকে কেন আর দুঃখ দেওয়া। ওদের মনের উত্তাপে গেরস্থর অকল্যাণ হয়।'

তাইত। ও লোকটা নিশ্চয় আমাকে গাল দিতে দিতে যাচ্ছে! আমি কানে শুনতে পাচ্ছিনে ঠিক, কিন্তু মনে তারই উত্তাপ এসে পৌঁছচ্ছে। কি মজা এই সংসারে—যে কথা কানে শোনা যায় না, সে কথা আগুনের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে মানুষের মনে।

না। ওর জন্য আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই! কিন্তু ভিক্ষে চাইতে এমন একজনই ত আসে না! বার বার বার—দে মা এক মুঠি ভিক্ষে—শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। সে এক মুঠি আসে কোথা থেকে? পেটের জন্য মানুষকে অষ্টপ্রহর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে। সেই শ্রমের অন্নে ভাগ বসায় যত কুঁড়ের দল ভিখিরির ছদ্মবেশে এসে। ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারে দেশময় অথচ কাজের কথা বললে বলে ব্যারাম হয়েছে। কাজ দিলে নিতে চায়না। বলে, আমি কি ডোম? আমি কি তাঁতী? আমি কি মুচি?

ঠিক সেই কথারই প্রতিধ্বনি নয় কি এই ঘাটোয়ালের মুখে? তিনি ঘাটোয়াল বটেন।"

সিদ্ধবাবা বলে, "এ জন্যই বলেছিলাম যে হিন্দু সমাজের জন্ম ও বংশগত সংস্কার জোঁকের মতো কামড়ে ধরে লেগে আছে ওদের মনে—টেনে ছাড়াতে গেলেই রক্তারক্তি কাণ্ড!"

বলি, "তবু ত না ছাড়ালে সমাজের অকল্যাণ! আমরা যাদের দয়া করি, দুঃখ দেখে আহা উহু করি, ওই ভিখিরিটা ত ওদেরই একজন। ওকে দয়া করা মানে ওর অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করা বই ত নয়। দয়ার নামে আমরা মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করি—দুর্বল মনে বল সঞ্চয় করি দুর্বলের সর্বনাশ সাধন করে—তাই নয় কি?"

"হ্যাঁ। সে কথা সত্যি। কিন্তু তার আগে চেষ্টা করতে হয় ওদের ওই অন্ধ বিশ্বাসকে দূর করার। চোখে ছানি পড়লে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, কিছুই দেখতে পায় না। কিন্তু ছানি কাটালে

আবার দিব্যি দেখতে পায়। কিন্তু সকলে ত ছানি কাটাতে পারে না! যারা পারে না তারা তাদের অন্ধত্বকে নিজের ভাগ্য বলেই মেনে নেয়। আমাদের সমাজের চোখে ঐ কুসংস্কারের ছানি যেখানে যেখানে পড়েছে সেগুলো কাটিয়ে দিলেই এ সব মিথ্যা জাত্যা-ভিমান নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সে কাজ এক দিনে হবার নয়। এক আধজনের চেষ্টাতেও হবার নয়।”

ব্রহ্মচারী হঠাৎ থেমে গেল। হাত জোড় করে প্রণাম নিবেদন করল যেন কার উদ্দেশে। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, ও তবু দাঁড়িয়েই আছে। অবাক দৃষ্টিতে কি না কি দেখছে!

শুধালাম, “ব্যাপারটা কি হে!”

মুখে কথা বলে না ও, ইশারা করে সম্মুখে কি জানি একটা দেখালো! আমি বুঝতে পারলাম না।

সিদ্ধবাবাকে বলি, “তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ নাকি হে সামনে?”

ও বললে, “কি আর দেখতে পাবো, আবার খেয়া পার হতে হবে। দেখছ না নদী। ঐ যে তার আঁকাবাঁকা রেখা দেখা যাচ্ছে এখান থেকেই।”

ব্রহ্মচারী মাথাটা ডানে বাঁয়ে কয়েকবার নাড়ল। তার মানে সিদ্ধবাবা যা বলছে তা ঠিক নয়!

বললাম, “বাবা, মুখটা একটু খোলোই না। এতক্ষণ ধরে কি সব মন্ত্রতন্ত্র জপ করতে লেগে গেছ এই পথের মাঝখানে?”

“কি মুশকিল! মায়ের মন্দিরের চূড়াটাও দেখতে পাচ্ছ না?” বলেই সে আবার হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে রইল আর তার ঠোঁট দুখানি বার বার নীরবে নড়তে থাকল।”

দশ

দ্বারকা নদী আবার সম্মুখে। ঘাটে এসে দাঁড়াই। ঘাটোয়ালকে দেখতে পাইনে। এই ত ঘাট ?

হ্যাঁ। ঐ যে তালের জোড়া ডোঙা ডুবে আছে কিনারে। খুঁটিতে মোটা রশি দিয়ে বাঁধা। এগিয়ে যাই। নেমে পড়ি নদীর জলে। টানতে থাকি রশি ধরে। ডোঙা তবু নড়ে চড়ে না।

তটিনী ছোটে আপন খেয়ালে। কেউ ডাকলেও একটু থেমে দাঁড়ায় না।

ছোটো ছেলেরা কুস্তি লড়ে। হাতের মুঠি শক্ত করে জড়িয়ে ধরে জলস্রোতে। চোখ বুজে বুক ফুলিয়ে উজান চলে দু চার পা। তারপর আর পারে না। হাত পা ছেড়ে দিয়ে এবার চিৎ হয়ে পড়ে থাকে মড়ার মতো। খেলাতে যেন হার মেনেছে মনে হয়।

খেলা দেখলে ত আর আমাদের চলে না। খেয়া পার হতেই হবে আমাদের। কিন্তু ডোঙা ডুবে আছে যে! ওটা কি আর ভাসবে না আজকে, ঘাটোয়াল কি ঘাটে আসবে না ?

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তিনজনে করি নানা জল্পনা কল্পনা।

তিনজনের মধ্যে সব চেয়ে ঢেঙ্গা আমি। তারপর ব্রহ্মচারী —আমার চেয়ে আধ হাত কম। আর সিদ্ধবাবা আরও ছ আঙ্গুল নিচু। কিন্তু মানে সম্মানে ওকেই আমরা উঁচু করে রেখেছি। আমাদের এই বামন অবতারটির মহিমা আমি লিখে প্রকাশ করতে পারি সে শক্তি আমার নেই। আমাদের নানা ভাবনাচিন্তা খুঁটি-নাটি ছাড়িয়ে ও অনেক দূরে বিচরণ করে বলে ওকে নাম দিয়েছি সিদ্ধবাবা। খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে যে সমস্যায় এখন পড়েছি তার কি

সমাধান করা যায় তা নিয়ে কিছু বলব ভেবে এগোই সিদ্ধবাবার কাছে।

কিন্তু ও যে কাপড় গুটোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মচারীও। ভাবখানা—দুহাতে কাপড় টেনে টেনে উঁকিঝুঁকি মেরে মেরে দুজনে ওরা পার হয়ে যাবে নদীটা।

আমি নির্বিকার দাঁড়িয়ে। নিরুপায়। পরনে চোঙার মতো প্যান্ট—পায়ের পাতার কাছ অবধি আঁট হয়ে চামড়ায় লেগে আছে। দুহাতে টেনে প্যান্ট উপরদিকে উঠাবার কোনো সুবিধেই নেই। হয় একেবারে সবটা খুলে হাতে নাও, নয় ভিজিয়ে নিয়েই ওপারে ওঠো।

কি করবো ভাবছি। ভিজালে যে ভেজাল অনেক। খাকি কাপড়ের প্যান্ট—সারাদিনেও শুকোবে না। ভিজেটা পরেই সব সময় থাকা কি সম্ভব ?

লোকজন কাছে কেউ নেই। কে আর দেখছে। খুলে ফেলব বেমালুম !

সিদ্ধবাবা বলে, "অত কি দাঁড়িয়ে ভাবছ ? কৌপীন নেই ভিতরে ?"

কৌপীনের কথা আমার মনেই ছিল না। ভাগ্যিস সিদ্ধবাবা ছিল সঙ্গে !

হাত দিয়েছি প্যান্টের বোতামে। এমন সময় একটা ছেলে এসে হাজির। শুধাই ওকে—"মাঝি কোথায় রে এই খেয়ার ?"

ছেলেটা যেন আমার কথা বুঝতে পারে না। হা করে তাকিয়ে থাকে।

আবার বলি, "এই নদীটা তোরা পার হোস্ কেমন করে ?"

"ঐ যে ডোঙা রয়েছে !"

"ডোঙা তো ডুবে আছে। মাঝি কোথায় ?"

"মাঝি নেই। ঘাটোয়াল আছে !"

"আরে ওই হল। তা ঘাটোয়াল কি আসবে না ?"

"এখুন ত জল কম বটে। নোকে হেঁটে হেঁটেই পেরয় বাবু!"

"আমরাও পার হতে পারব তবে?"

"হ্যাঁ।"

"কোন দিক দিয়ে নামবো বলতো?"

ছেলেটা শুনিনি শুনিনি ভাব দেখিয়ে ছুটে পালায়। একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ায়। ভাবি, এ আবার কি লীলা। কথা নেই বার্তা নেই পালিয়ে গেল কেন!

ডাকি, "ওরে কাছে আয়, ভয় নেই কিছু, আয়…!"

দূরে থেকেই ঘাড় কাৎ করে বলে, "পয়সা দিব্‌বে বটে!"

বলি, "কাছে আয়না আগে। আমাদের ওপারে নিয়ে যা। তবে ত পয়সা!"

সিদ্ধবাবা আর ব্রহ্মচারী দু জনেই নদীতে নেমে কিছুটা এগোয় আবার ফিরে ফিরে আসে। সব জায়গায় নদী সমান গভীর নয়। একটা পথ নিশ্চয় আছে—যেখান দিয়ে লোক চলাচল করে। কিন্তু আজ বুঝি একজনও এ পথে চলবার নেই!

পায়ের চিহ্ন দেখা যায়না একটিও। ঘোলাজলের স্রোতে সব মুছে যায়। কাছাকাছি জায়গাতেই চেষ্টা চলে ব্রহ্মচারী আর সিদ্ধবাবার। কিন্তু একটু এগোয় যদি তাহলেই মনে হয় ডুব জলে পড়ি পড়ি। তা ছাড়াও স্রোত, দুরন্ত স্রোত। শরীর সোজা রাখা যায়না। তার উপর সকাল থেকে সারাক্ষণ একটানা হাঁটা তিন চার ক্রোশ। সেও আবার যা পথ! জলে ডুবনো ধান ক্ষেতের আল। বর্ষায় লদলদে আলের মাটি। মাটির তলায় শত্রুবিধ্বংসী মাইন পাতা—কুল কাঁটা বাব্‌লা কাঁটা। সেও তো পেরিয়ে আসা গেল। আটকা পড়বো একেবারে পীঠের ঘাটে এসে! এই খেয়াটা পার হলেই একেবারে সোজা উঠব গিয়ে মায়ের মন্দিরে।

পকেট থেকে মুদ্রা খুলে নিয়ে দেখাই ছেলেটাকে। সূর্যের

আলোয় চক্‌চক্‌ করছে চৌকো নূতন চাকতি। ছেলেটার মন ধরে এতক্ষণে! আবার আসতে থাকে আমার কাছে। এসেই হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

কচ্ছপের গলার মতো আমিও হাতটা নিজের দিকে নিয়ে আসি। বলি, "আগে পার হয়ে নিই—তবে তো তুই পাবি!"

ছেলেটা বলে, "পেন্টুল ভিজবে যে!"

বললাম, "নারে, খুলেই ফেলব এটা।"

হি হি করে হাসতে থাকে ছেলে। সে নিজে যে ন্যাংটো এতক্ষণে বুঝি তার মনে পড়ে। নিজের লজ্জাটুকু দুহাতে ঢেকে রেখে সে হি হি করে হাসে।

"এই দ্যাখ্‌, খুলে ফেললাম!"

এবার হাসি বন্ধ হয় ওর। অবাক হয়ে দেখে সে বলে, "আরও একটা ছিল যে!"

নদীর ধার বেয়ে বেয়ে আমরা চলি ছেলেটার পায়ে পায়ে। তারপর একটা জায়গায় এসে সে নামে জলে।

এবার কে আগে যাবে? সিদ্ধবাবা আর ব্রহ্মচারী ঠেলে দেয় আমাকেই।

গান গেয়ে গেয়ে চলছে আমাদের গাইড্‌। সুর আসে কানে —কথা তলিয়ে যায় নদীর স্রোতে। হঠাৎ সে গান ছেড়ে দিয়ে পিছন দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, "হোঁথা কোঁথা যাচ্ছো—এই ডুবলে, এই ডুবলে!"

সাবধান ছিলাম। আরও সাবধান হই। ভয় ঢোকে—এই বুঝি ডানে হেলি, এই বুঝি বাঁয়ে হেলি। জলের তলায় মাটিকে ত বিশ্বাস নেই। কোথায় ঢিবি, কোথায় খানা—কেমন করে বুঝি! ভাগ্যিস্‌ এই ন্যাংটো ছেলেটাকে পাওয়া গিয়েছিল!

ব্রহ্মচারী পারে উঠে এসে বলে, "একবার ভেবে দ্যাখো এই ছেলেটা আসলে কে?"

সিদ্ধ বলে, "তারাপীঠের ক্ষ্যাপাবাবাই হয়তো বা।"

ব্রহ্ম বলে, "ঠিক বলেছ! তা নইলে ন্যাংটো হবে কেন?"

আমি বলি, "আর বুঝি কাজ নেই তাঁর! ক্ষ্যাপাবাবা ছুটে আসবে একটা পয়সার জন্য আমাদের পিছু পিছু! তাঁর বুঝি পয়সার অভাব ছিল। কত গণ্ডায় গণ্ডায় তাঁর শিষ্য ছিল। তাঁরা ইচ্ছে করলে বাবাকে পয়সা দিয়ে ঢেকে দিতে পারতেন।"

ব্রহ্ম বলে, "ভুল বলছ। তিনি ইচ্ছে করলে শিষ্যদের পয়সা দিয়ে ঢেকে দিতে পারতেন।"

সিদ্ধ বলে, "ক্ষ্যাপাবাবার স্থানে উঠেই তাঁর প্রসঙ্গ করছি। সত্যি মিথ্যে জানিনে বাবা, যেমন শুনেছি তেমন বলছি। তিনি নাকি একবার তাঁর এক শিষ্যকেই চুরির দায়ে শাস্তি দিয়েছিলেন। শিষ্য তাঁর পয়সা চুরি করেছিল।"

ব্রহ্ম বলে, "হ্যাঁ, তা করবেন বই কি। সে কি তিনি পয়সার মায়ায় করেছিলেন বলতে চাও? তিনি করেছিলেন লোকশিক্ষার জন্য। পাপ কাজ করলে তাঁর প্রিয় শিষ্যেরও ছাড়াছাড়ি নেই, সে কথাই তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন।"

নদীর কূল থেকে এবার আমরা উঁচু জমিতে উঠে এসেছি। আমি একটু আগে। সিদ্ধবাবা আর ব্রহ্মচারী পিছনে একসঙ্গে।

ন্যাংটো ছেলেটা ওদের পিছু পিছু আসছে।

ডেকে বলি সিদ্ধকে, "চারটে পয়সা দিয়ে দাও ছেলেটাকে।"

সিদ্ধ পকেটে হাত ঢোকায় দেখতে পাই আমি। আবার নিশ্চিন্ত হয়ে এগিয়ে চলি। পিছু তাকাইনে।

থামি এসে মায়ের মন্দিরের দরজায়। এ ঠিক মন্দিরের দরজা নয়। মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশের পথ।

এর আগেই চোখে পড়েছে—বাঁদিকে একটা নির্জন ঘর। ঘরের পিছনেই গাছগাছালি আর জঙ্গল। কালো কালো পোড়া কাঠ

আর শাদা শাদা বালিশের তুলোর মতো কি সব ছড়িয়ে আছে ওখানটায়।

ব্রহ্মচারী কাছে এসে দাঁড়াতেই ওদিকটার দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

ও বলল, "এই সেই মহাশ্মশান!"

শ্মশানেশ্বরের উদ্দেশে হাতজোড় করে ব্রহ্ম প্রণাম নিবেদন করল।

সুন্দর একটা বাড়ি ডানদিকে। বাড়ির সম্মুখে সুন্দর বাগান। নূতন নূতন যত গাছপালা তাতে। চোখের তৃপ্তি কলাগাছগুলো। দুপুর রোদে অসংখ্য পাতার ঝিলিমিলি মনকে কোন স্বপ্নলোকে নিয়ে যায়। সারাটা বাড়ি জুড়ে সবুজের ঢেউ আর ঢেউ। কিন্তু হঠাৎ মনটা খাঁ খাঁ করে উঠল—এতগুলো দরজা এত এত জানলা, খোলা নেই কেন একটাও। পরদা কেন ওড়েনা হাওয়ায়। দু হাতে ফাঁক করে তাকায় না কেন কোনো ছোট্টো বন্ধু!

সিদ্ধবাবা খোঁচা লাগায় আস্তে আমার পিঠে। চমকে উঠে দেখি সামনে একজন দাঁড়িয়ে—হাঁটুর উপর তুলে পরা একখানি শাড়িপাড়।

আমরা নিচু জমিতে আর তিনি উপরে চত্বরে দাঁড়ানো। ঘাড় একটু পিছনে বাঁকিয়ে তাঁর দিকে তাকাই। কোনো মহিলা তিনি নন—বেঁটে খাটো সুদর্শন পুরুষ মানুষই। আড়ম্বরহীন বেশ। অনাবৃত শরীর। মুখের দিকে তাকাতেই শুধালেন, "কোথা থেকে আসছেন আপনারা?"

চটপট উত্তর দিতে পারিনে। কোথা থেকে বেরিয়েছি! কি উত্তর দেবো এ প্রশ্নের? হয়ত এক জায়গা থেকে বেরিয়েছি আমি আর অন্য জায়গা থেকে আমার সঙ্গীরা। মাঝপথে কোথাও হয়ত সকলে একসঙ্গে মিলেছি। তারপর নানা জায়গা ছুঁয়ে এসেছি। কোন জায়গার নাম বলবো? ঠিক এর আগে যে জায়গায় ছিলাম

সে কথাটাই বলবো কি ? মনের এতগুলো প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গে দিতে পারে একমাত্র সিদ্ধবাবা। ডাকি তাকে কাছে।

সে এসে বলে, "দাঁড়াও একটু, আগে বিজ্ঞাপনটা পড়ে নিই।"

কিসের আবার বিজ্ঞাপন ? মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে দেখতে পাই—এই মন্দিরের বিষয়েই—তারাপীঠ দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে কয়েক-জন পাণ্ডার স্বাক্ষরিত এক উপদেশ নির্দেশের তালিকা ঝুলছে দেয়ালের গায়ে।

সুদর্শন পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াল আরও জনা দুই। মুখ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল, "আসুন, ভিতরে আসুন আপনারা !"

সুদর্শন পুরুষের মুখে প্রতিবাদের সুর, "রাখো, আগে জেনে নিই ওঁরা কার লোক। কোথা থেকে আসছেন। আমি ত আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছি !"

সেই ন্যাংটো ছেলেটা আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। ভিতর থেকে ওর উদ্দেশে তিরস্কার আসে, "এই ব্যাটা, ভাগ, বাবুদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেন রে ?"

সিদ্ধবাবাকে শুধাই, "পয়সা দাওনি ওকে এখনও ?"

সিদ্ধ মুখ কালো করে বলে, "না। দিইনি। পি, পি !"

আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল। পথ চলতে পি, পি হলে পথ চলা বন্ধ হবে যে ! তীর্থস্থানে পাণ্ডারা হল গোয়ালার মতো। যাত্রীর পকেটে একফোঁটা দুধ থাকতে ওরা টানাটানি বন্ধ করে না শুনেছি। কিন্তু পিকপকেট হল কোথায় ? ফাঁকা মাঠের মধ্য দিয়ে ত বরাবর এসেছি !

এগারো

এবার আমরা ঢুকব। কিন্তু ভিতর থেকে এক গাদা লোক উঁকি দিয়ে রয়েছে। স্টিমার থেকে ডাঙায় ওঠার কালে গোয়ালন্দ-ঘাটে কুলিরা এমনি চাক বেঁধে দাঁড়ায়।

আমরা কিছুই কথা বলছিনে। ওদের মধ্যেই কথার যুদ্ধ শুরু হয়েছে। কেউ হাত পা নাড়ছে, কেউ বা চোখ লাল করে উঠছে। আবার সকলেই আমাদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছে, "আসুন, আসুন।"

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিনে। তবু তীর্থস্থানের পাণ্ডার গল্প অনেক তীর্থ ফেরত ঘুঘুর কাছে শুনেছি। তাই মনে হল, ওদের খপ্পরে না পড়ি—সেটুকু সতর্কতা রাখতে হবে নিজেদের জিম্মেয়।

উত্তেজনাটা একটু ভাঁটা পড়ুক ওদের। তখন নিজেদের সুবিধে মতো ঢুকবো আমরা মন্দির-চত্বরে। আস্তে সুস্থে। ভেবে আমরা একটু পিছিয়ে এলাম। ভাজা বাদামের গন্ধ উঠছিল। বড় লোহার কড়ায় সম্মুখেই বাদাম ভাজছে দোকানী। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি বসবার কোনো ব্যবস্থা নেই। ছোট্ট খড়ের চালা। গোটা দুই উননেই সারাটি বারান্দা দখল করে আছে।

সুদর্শন পুরুষ এখানটাতে নেমে এলেন। শুধালেন আবার, "আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?"

ব্রহ্মচারী উত্তর করে, "রামপুরহাটের কানাইবাবুকে চেনেন?"

প্রশ্নকর্তা আর উত্তর দিতে পারেননা। হয়ত তিনি কানাইবাবুর নাম এই প্রথম শুনলেন আমাদের মুখে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, "আপনাদের বাড়ি?"

"পূর্ববঙ্গের পূর্ব সীমায় !"

ভিতর থেকে আরও তিনজন বেরিয়ে এলেন। সুদর্শনপুরুষ এবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমাদের থলি ঝুলির দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "আসুন আপনারা আমার সঙ্গে।"

অন্য পাণ্ডারাও বলে উঠলেন সমস্বরে, "আসুন, কানাইবাবুকে আমরা জানি।"

আমি আর ব্রহ্মচারী ইতস্তত করছি দেখেও সিদ্ধবাবা ভিতরে ঢুকে পড়ল সুদর্শন পুরুষের সঙ্গেই। আর আমাদের ডাকতে লাগল, "চলে এসো না !"

কিন্তু তিনজন পাণ্ডা আমাদের দুজনকে নিয়ে টানাটানি শুরু করেছেন।

বললাম, "দেখুন মশায়রা, আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকবো। পথ ছেড়ে দিন !"

ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। তিন পাণ্ডা পিছন পিছন ডেকে বলল, "মশায়রা দাঁড়ান। আগে ঠিক হোক কানাইবাবু কোন পাণ্ডার লোক।"

সিদ্ধবাবা বলল, "আমরা মশায় সকলেরই সম্পত্তি।"

"সে কথায় চলবেনা। আমাদের খাতা খুললেই বুঝতে পারবো।

তারাপীঠে সাড়া পড়ে গেল। পাণ্ডারা ছুটতে থাকেন যে যার ঘরে খাতা নিয়ে আসবার জন্য।

ও দিকের দরজা দিয়ে হঠাৎ আরেকজন ঢুকলেন এসে। প্রায় ছুটেই এলেন তিনি। দাঁড়ালেন এসে আমাদের সম্মুখে। খাতা তাঁর হাতে নেই। তবু চোখে মুখে এক অদ্ভুত জিজ্ঞাসা।

চমকে উঠলাম আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে—মনে হল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাল থেকে উঠে এসেছেন ইতিহাসপুরুষ চাণক্য। কোনো কথা তিনি বললেননা। আমাদের হাত থেকে কাঁধ থেকে ছিনিয়ে নিলেন থলি ঝুলি ছাতা।

আমরা প্রতিবাদ করিতে পারলাম না। অবাক—শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম ওঁর দিকে, ওঁর বীরত্বের কথা বুঝি ভাবতে লাগলাম!

আপন মনে তিনি এগিয়ে চললেন। চত্বর থেকে নামতে বুঝি হঠাৎ মনে পড়ল তাঁর যে আমরা তখনও অনেক পিছনে পড়ে আছি, তাই বললেন হেঁকে, "দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আসুন। বিশ্রাম করুন এসে আমার বাড়িতে।"

সুদর্শনপুরুষের মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে উঠল। তাঁর ছেলে দুটি দু'পাশে দাঁড়িয়ে! ওদেরও দৃষ্টিতে নিরাশার অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে দেখলাম। এরা যেন আর এক পা নড়বার শক্তি পাচ্ছেনা। বুঝি ওই জায়গাতেই এখনি ধপাস্ করে বসে পড়বে আর কাঁদতে শুরু করবে আমাদের পেল না বলে!

মন্দিরের সীমা ছাড়িয়ে আমরাও নেমে যাই আস্তে আস্তে ও-ধারের ফটক দিয়ে। টুক করে পিছন ফিরে একবার দেখে নিই সুদর্শন পুরুষের মুখখানি। ওর বিষণ্ণদৃষ্টি ধিকি ধিকি জ্বলছে নিরাশায়। মনে কি রকম বাজে যেন। সঙ্গীদের বলি আমি, "একটা অন্যায় হল কিন্তু!"

সিদ্ধবাবা শুধায়, "কি অন্যায়? কার অন্যায়?"

"সে কথা অবশ্য বলা শক্ত। তবু, যে পাণ্ডা প্রথমে অভ্যর্থনা করল, উচিত ছিল আমাদের ওর ওখানেই ওঠা। তা ছাড়া পরনে শাড়িপাড় থাকলেও ওর চেহারাটা ছিল বেশ একটু গোঁসাই গোঁসাই। আমাদের মনের পক্ষে সে হত তৃপ্তিজনক।"

"আমাদের তৃপ্তি হলেও পাণ্ডার তৃপ্তি নষ্ট হত !"

"কেন ?"

"আমাদের ট্যাঁকের খবর ত ও জানেনা !"

একটু ভেবে নিয়ে ব্রহ্মচারী বলে গম্ভীর স্বরে, "চাণক্যঠাকুর কি আমাদের সব খবর জানতে পেরেছেন ?"

"সে না জানুন ! তবে তিনি যে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, এই কর্মের ফল ত ওঁকে পেতে হবে ! কর্মফল অখণ্ডনীয় এটা ঠিক ঠিক প্রমাণ হয়ে যাবে। লোভে পড়ে যে যাই করুক, শাস্তি তাকে পেতেই হবে। কথায় বলে, পাপ বাপকেও ছাড়েনা !"

দু ধারে মাটির দেয়াল। ক্ষয়ে ক্ষয়ে হয়েছে যেন নদীকূলের বটগাছের শিকড়। যেন কোনোরকমে দাঁড়িয়ে আছে। কখন হুমড়ি খেয়ে পড়বে ঠিক নেই। মাঝখান দিয়ে ছোটো গলি। পথটা যেন নালার আকারে একটানা নিচু হয়ে এগিয়ে গিয়েছে। সারা বর্ষাকালের জলের ধারা গড়ানোর চিহ্ন যেন। ঐ চিহ্নে পদচিহ্ন মিশিয়ে আমরা চলতে থাকি এক জনের পিছু আরেকজন। চাণক্যঠাকুর আমাদের আগে আগে। এক পা এগিয়েই একবার পিছনে তাকান আর বলেন, "চলে আসুন, এই যে আমার বাড়ি !"

আরও একটা ভীষণ সরু গলিতে পড়েছি আমরা। আমার মনে ভাসে রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের বীভৎস যত দৃশ্য। অশান্ত করে তুলল। তাকালাম সঙ্গীদের মুখের দিকে। ওদের প্রসন্ন বদন—যেন চিত্ত হেথা একেবারেই ভয়শূন্য !

একটা বন্ধ দরজার সামনে ওরা থামল। আমিও। চাণক্য আরেকটু এগিয়ে গিয়ে পড়লেন ভিতরে।

দরজায় কাঠের পাটায় সিঁদুরের চন্দনের অসংখ্য ফোঁটা।

রাঙামাটির প্রলেপমাখা দেয়ালে আঁকা নীলরঙের ছবি। ময়ূর? না, ময়নার? ব্রহ্মচারী নাম করা শিল্পী। আপনারা যাঁরা গেল সাত বছরের ভালো ছবির খবর রাখেন, তাঁরা এঁর কয়েকখানি ছবি দেখেছেন। কোনো এক সরকারী কলা বিদ্যালয়ের উপাধ্যায় তিনি। ছবিচিত্রের খবর ভালো জানা আছে ওঁর। বিশেষ করে গ্রামীণ শিল্পের অতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে গবেষণাকারীদের মধ্যে তিনি একজন ভুয়োদর্শী। ভারতসরকারের বৃত্তি নিয়ে তিনি বীরভূমের মঠমন্দির প্রদক্ষিণ করেছেন। কাজেই তাঁকে এ বিষয় জিজ্ঞেস করা চলে।

তাঁকে জিজ্ঞেস করতে যাবো এমন সময় যেন হঠাৎই দরজাটা খুলে গেল। খুলে দিল কে যেন ভিতর থেকে।

বারো

ছোট্ট ঘরখানি। কাঁচা মেঝে। মাটিগোবরে নূতন করে নিকোনো। একটিও জানালা নেই। দেয়ালে টাঙানো নানা রকমের কাঠের ফ্রেমে কাচে বাঁধানো ছবি। দশবতার দশমহাবিদ্যা থেকে শুরু করে মহাত্মা গান্ধী আর নেতাজী সুভাষ কেউ বাদ নেই। ছিন্নমস্তার ছবিটি কৌতূহল জাগালো ব্রহ্মচারীর। মা এলোকেশী তাঁর নিজের মুণ্ড নিজে ছেদন করে নিজের হাতে ধরে আছেন। কাটা ধড় থেকে রক্তের ধারা ফোয়ারার মতো ঝরে পড়ছে ছিন্নমুণ্ডের মুখগহ্বরে। ব্রহ্মচারী চাণক্যপ্রতিমকে শুধাল, "ঠাকুরমশায়, আপনি এই ছবিটার বিষয় কিছু বলতে পারেন ?"

"কেন পারবনা ! যে ছবির বিষয় আমি জানিনে সে ছবি আমার ঘরে রাখতে যাবো কেন ?'' বলতে বলতে চাণক্য বেরিয়ে পড়লেন।

এক্ষুনি ফিরে আসছেন ভেবে ওঁর মুখের উদ্দেশ্যে হা করে তাকিয়ে রইল ব্রহ্মচারী।

চোখ বুলিয়ে দেখছি ঘরের চারদিকে। ঘর নয়—যেন কালী-ঘাটের একখানি ছবির দোকান রাতারাতি এনে কে এখানে বসিয়ে দিয়েছে। এ জন্যই কি জানলা নেই ! চারটে জানলা ঘরে থাকলে অনেক ছবি এ ঘরে কম ধরত যে !

হন হন করে এলেন আবার। একখানি মাদুর বিছিয়ে দিলেন মেঝেতে। খেজুর পাতায় বোনা। বেশ মোলায়েম। বসে আরাম পেলাম তাতে।

গাড়ুতে করে জল এনে রাখলেন ভিতরের বারান্দায়। আর কয়েকজোড়া খড়ম।

ওরা দু'জন সটান হল মাদুরের ওপর। বললাম ওদের, "চরণযুগল মার্জিত করে এসো গে আগে!"

উত্তর হল, "আমাদের চরণ চর্মাবৃত ছিল। পুনঃ প্রক্ষালন নিষ্প্রয়োজন!"

আমি খালি পায়ে চলি বলে আমার উদ্দেশে সিদ্ধবাবা এ ইঙ্গিত করল!

ভিতরে ছোট উঠন! তাতে ধান ছড়ানো। সেদ্ধ ধানের গন্ধ উঠছে। এক পাল কাক কা কা কা কা করে ডাকছে থেকে থেকে। আর নেচে নেচে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধান ভাঙছে কট্ কট্ কট্ কট্! চারদিকে নিস্তব্ধ দুপুর!

হুঁকো হাতে নিয়ে এক বুড়ো বেরলেন। কোমরে ফাঁস দিয়ে হাঁটু অবধি কাপড় পরেছেন তিনি। উনেনের হাঁড়ির গায়ের মতো রঙ তাঁর! হঠাৎ দেখে ভয় হল। মনে পড়ল—এতো বেশি কালো বামুন বড় অপয়া! কানে কানে বললাম কথাটা সিদ্ধবাবার। সে বলল, "তাকাও ওঁর শাদা ভুরু আর শাদা চুল আর শাদা দাড়ি-গোঁফের দিকে, তবেই মনের সংশয় ঘুচে যাবে!"

তাকাতেই বুড়ো কলকে ছুঁড়ে মারলেন। আমার দিকে নয়—উঠনের কাকগুলোর উদ্দেশ্যে। হুঁকোটা হাতে রইল তখনও!

উঠন পেরিয়ে ছোট্ট একটা ডোবা। শেওলা আর কুচো কচুরিতে জলের রঙ সবুজ। চাণক্যপ্রতিমকে শুধাই, "এই জল দিয়ে কাজ করেন আপনারা?"

"না!"

"তা হলে?"

"আমরা কুণ্ডের জল খাই। কুণ্ডের জলেই রান্নাবান্না সব কিছু হয় আমাদের।"

অবাক হয়ে বলি, "এখানে আবার কুণ্ড কোথায় ?"

"ঐযে দেখেননি, মায়ের মন্দিরের সম্মুখেই !"

"সত্যি ! কুণ্ড আছে, শুনেছি চাঁটগাঁয়ে, মুঙ্গেরে···"

বলতেই বাধা দিয়ে চাণক্য বললেন, "মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া কাঁদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ! পাণ্ডারা আসিয়া গলে পরাইয়া দিল বর গুঞ্জমালা !"

বললাম, "সে আবার কি ?"

অবাক হয়ে পাণ্ডা বললেন, "কেন, শোনেননি এই কবিতাটা ? আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত কবির লেখা।"

সিদ্ধবাবা বলল, "দেবেন সেনের 'তবু ভরিলনা চিত্ত' থেকে বলছেন আর কি !" আমার দিকে চোখ ঠেরে বলল, "পাণ্ডাদের কত শ্রদ্ধা করতেন সেই বিখ্যাত কবি !"

বললাম, "কিন্তু তারাপীঠে কুণ্ড আছে বলে ত জানতাম না ভাই ? রাজগীরে, বক্রেশ্বরে আমি নিজেই গিয়েছি। গরম জলের কুণ্ডে সেখানে স্নান করেছি। ত্রিপুরায়ও একটা কুণ্ড আছে। যাইনি সেখানে। ও গুলো ত গরম জলের কুণ্ড। কিন্তু তারাপীঠের কুণ্ড ?"

"এটা ঠাণ্ডা জলেরই। তবে এর মহিমা আছে খুব। আপনারাও ওখানেই স্নান করবেন। করলেই বুঝতে পারবেন আমার কথা সত্যি না মিথ্যে !"

শুধালাম, "কত দূরে ?"

"এইত কাছেই। যাননা এক্ষুনি, আরাম পাবেন ডুব দিয়ে ওতে। ব্যাধি ব্যারাম কিছু থাকে তো সেরে যাবে। মায়ের কুণ্ড কিনা !"

রেডিও অ্যাক্‌টিভ গুণ আছে কোনো কোনো কুণ্ডের জলের। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে আর বক্রেশ্বরের কুণ্ডের জলে সালফুরেটেড্‌ হাইড্রোজেনের গন্ধ পাওয়া যায়। ও-গুলোর তাপমাত্রা যথাক্রমে ১৭০ ও ১২৮ ডিগ্রি। ওই জলে বাত ও চর্মরোগ দূর করে। গরমজলের এই কুণ্ডগুলোর প্রশংসা বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র করে গেছেন। তাঁর প্রশংসায় বিশ্বাস করে যাঁরা সে সব কুণ্ডে স্নান করেছেন তাঁরা সত্যি ফল পেয়েছেন। আমি নিজেও এক আধবার। কিন্তু বড় বেশি দূর বলে সব সময় যাওয়া আসা যায়না। তাই ভাবছিলাম যদি, এই কুণ্ডের জলেও তেমন কিছু বিশেষ গুণ থেকে থাকে তাহলে সস্তায় অনেক কাজ হয়ে যায়! পাণ্ডার কথায় বিশ্বাস করব কি করবনা ভাবছিলাম।

তেলের বাটি হাতে করে নিয়ে এসে ঢুকলেন এক বিধবা। পরনে ময়লা থান। সেও এমনি ছোটো মাপের যে দেখে মনে হয়, মেয়ের খানি মা পরে এসেছেন। পাত্রটি হাত থেকে নামিয়ে রেখে বললেন, "আপনারা তেল মাখুন। বেলা হয়েছে। মুখ শুকিয়ে উঠেছে!" একটুখানি থেমে একটুখানি ইতস্ততঃ করে বললেন, "আপনাদের এখন তুমি বলেই ডাকবো। রাগ করবেনা তো ?"

"না। না। রাগ করবো কেন!"

একটু হেসে বললেন, "তোমরা আমার ছেলের মতোই কিনা! দাঁড়াও, নিয়ে এসে তোমাদের দেখাই আমার ছেলেটাকে।"

ভিতরে ঢুকে পড়লেন তিনি। ফিরেও এলেন—সঙ্গে একটি ছেলে। বয়স ষোলো সতেরো হবে। কালো পাথরে খোদাই করা মূর্তিটি যেন। মাথা নিচু করে সে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

মা বললেন, "এইত সেদিন ওর পৈতে দিয়েছি। দেখছোনা, মাথার চুল এখনও কদমফুলের রোঁয়া যেন!"

কলকেটা খুঁজে পেয়েছেন বুড়ো। যাত্রাদলের শিবের মতো নাদুসনুদুস দেখতে। কিন্তু বড় চোখে কি রকম ভৈরব দৃষ্টি। হঠাৎ দেখলে সত্যি ভয় করে। হঠাৎই তিনি আবার ঢুকলেন আমাদের ঘরে।

দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখে চললেন আমাদের। হুঁকোয় চুমুক দেননা। একটি কথাও বলেননা। যেন একটা স্ট্যাচু। কি যেন সংকল্প সাধন করবেন বলে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ!

উঁচুদরের সাধক টাধক নয়তো আবার! বামাক্ষ্যাপার স্থানে এসে কারও সম্বন্ধে কিছু খারাপ ধারণা করতেও ভয় করে!

ছেলেটি এসে বলে, "চলুন, আপনাদের কুণ্ডে নিয়ে যাই।"

আর ডাকে, "পিসিমা, পিসিমা, তালচাবিটা নিয়ে এসো!"

সেই বিধবার হাত থেকে তালাচাবি নিলাম। কিন্তু সেই কালভৈরব এখনও দাঁড়িয়ে। মনটা উসখুস করতে থাকে। তিনি বুঝতে পারলেন বুঝি। বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সঙ্গীরা আমাকে বাইরে গিয়ে ডাকে, "বেরিয়ে এসো শিগগির!"

আমি ভেবে পাইনে—সঙ্গে করে কি নেবো, আর ঘরে কি রেখে যাবো! তালা ওরা দিয়েছে সে কথা ঠিক, কিন্তু এর ডুপ্লিকেট চাবি যে ওদের কাছে নেই সেই বা কি করে জানি! আমরা যখন কুণ্ডে মনের আনন্দে স্নান করব, তখন এদিকে যদি কোনো কাণ্ড হয়ে যায়! থলি ঝুলি সব পড়ে থাকবে অসহায়ের মতো আর আমরা চলে যাবো নিশ্চিন্ত হয়ে! সঙ্গীরা আমার একেবারে কাণ্ডজ্ঞান শূন্য। কেবল তাড়া লাগাচ্ছে—বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো!

বেরিয়ে পড়তে হয় শেষ পর্যন্ত। তালাও আটকাই। কিন্তু হঠাৎ খেয়াল হয়, ভিতরের দিকের দরজাটা বন্ধ করা হয়নি। ওদিক দিয়ে ঢুকে ওরা যা খুশি করতে পারে।

ভাবতে ভাবতে আবার দাঁড়িয়ে যাই। এখন আবার দরজা খুলতে গেলে বাড়ির লোকগুলোই বা কি ভাববে!

সিদ্ধবাবা বলল, "আবার ভাবচ কি, চলো!"

পাণ্ডার ছেলেটিও কাছেই দাঁড়িয়ে। এখন আবার দরজা খুললে ওই বা কি মনে করবে! ভাববে, ওদের আমরা শুধু সন্দেহই করি।

তেরো

আবার মন্দির-চত্বরে ঢুকি। মন্দির পিছনে রেখে সম্মুখে এগিয়ে যাই। পাই বাঁধানো ঘাট। চওড়া সিঁড়ি। খুব প্রাচীন কালের না হলেও বেশ পুরনো। বয়সের ভারে এক আধটা ধাপ নুয়ে পড়েছে, ঝুঁকে পড়েছে জলের দিকে। হঠাৎ পা ফেলতে গিয়ে ভয়ে বুকটা তুরতুর করে ওঠে। এরই একটা ধাপে পা ছড়িয়ে বসে পড়ি।

কোথায় কুণ্ড? এ যে প্রকাণ্ড এক পুকুর। পুকুর নয়, দিঘি বলা চলে একে। পারের কাছাকাছি দলেদামে জল ঢাকা। ঘাটের সম্মুখে খানিকটা জায়গা বেশ পরিষ্কার। তাতে ফটিকজল টলমল করে। অনেক গভীরে মাটি দেখা যায়। রক্তরঙ শাপলা হাসছে জলের ওপর। ডগাটা কেমন করে মাটি থেকে বেরিয়ে এল জানবার জন্য দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

জামা খুলে রেখে জলে নেমে পড়ি। একটু দূরে সাঁতরে যাই। কি রকম ভয় ভয় করে। একা নেমেছি এক অচেনা পুকুরে। এর জলে কিছু নেইত—যার নাম মাত্তা, সিন্ধুক, শেকল! মনে মনে কত গল্পই তখন উঁকিঝুঁকি মারছে—ছেলে বেলায় শুনেছি কোথাকার এক পুকুরে কে নেমেছিল আর তার পায়ে এসে বেড়িয়ে ধরল একটা কিসে যেন। সে যত পাড়ে এসে উঠতে চায়, শিকল তত তাকে টানে জলের নিচে। সে চীৎকার করতে থাকে। লোকজন আসে চারিধার থেকে। তাকে তোলে পুকুরের পারে, কিন্তু পায়ের শেকল যত টানে ততই আসে। পুকুরের পার ভরতি হয়ে গেল শেকলে তবু শেষ হলনা। এমনি শেকল ওটাকে কিছুতে কাটাও

যায়না। সারাদিন গেল এমনি ভাবে। সন্ধ্যেবেলায় হঠাৎ এক ভয়ংকর শব্দ করে সব শেকল সে লোকটাকে টেনে নিয়ে জলে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই আমিও চলে আসি ধাপের দিকে। দৃষ্টি যায় ওপরে। সেই যাকে প্রথম দেখেছিলাম—সুদর্শন পাণ্ডা। মুখে তাঁর নিরাশার ব্যঞ্জনা গাঢ় হয়েছে আরও। সঙ্গীদের ইঙ্গিত করি। ওরা দু জনেই অন্যমনস্ক।

ওরা জলে নামে। একটু সাহস বাড়ে। বলি, বড় ভারি জল। ওরা বলে, এই ভালো লাগে। বলি, যদি অসুখ করে? ওরা বলে পাণ্ডা বলেছে, অসুখ সেরে যায় এই জলের গুণে। তা ছাড়া কত কাল পরে এমন গা ডুবিয়ে চান করছি! বীরভূমের বাঁধা পুকুরে এমন সাঁতার জল কটাতে আছে!

তারাপীঠের তারাকুণ্ডে শরীর ডুবিয়ে আছি। মনে পড়ে কোপাই-এর জলে এমনি শরীর ডোবানোর কারসাজির কথা। জলের তলাতেই সারা শরীরে লোম দাঁড়িয়ে যায়—এমনি ভয়ংকর সে স্মৃতি!

সেদিনও এমনি তিনবন্ধু বেড়াতে গিয়েছিলাম কংকালীতলায়। সঙ্গী দু জন বসেছিলেন কংকালীকুণ্ডের গাছতলায়। জল কম বলে নদীতে ওরা আসেন নি স্নান করতে। আমি একা একাই নদীতে এলাম শেষে।

হাঁটু অবধিও ডোবে না—এমনি জল কোপাইর। তবু স্নান করা চাই আমার। শুয়ে পড়ি লম্বা হয়ে নদীর মাঝখানে। তাতে সারা শরীরই ডোবে। ঝিরঝিরে স্রোতে একটু একটু করে আমাকে ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায়। আরামে আমার চোখ বুজে আসে।

কেউ কোথাও নেই। নীরব নির্জন। দু দিকেই ঘন বন ওখানটাতে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে একটা ভীতি ঢুকল। তাই কান দুটো সজাগ ছিল আমার। আমি স্রোতের জলে ভেসে যাই কিছুটা পথ আবার উঠে উজিয়ে এসে শুয়ে পড়ি লম্বা হয়ে। কিছুক্ষণ ধরেই এ রকম চলছে।

একটা শব্দ এল কানে—কে যেন পা ফেলছে আর পা তুলছে নদীর জলে—চপ্ চপ্ চপ্…চপ্ চপ্…চপ্ চপ্…চপ চপ্…

চটপট উঠে বসি। দেখি সম্মুখে একটা কুকুর। ভীষণ বন্য চেহারা। চোখে মুখে হিংস্রস্বভাব! আমাকে ধরবে বলে এসেছিল। শোয়া থেকে আমি হঠাৎ উঠে বসতেই বুঝি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দু পা পিছিয়ে গেল সে! কুকুর ভেবেছিল আমি মরে গেছি। এমন কত মড়া হয়ত স্রোতের জলে ভেসে ভেসে যায় আর সে ব্যাটা ধরে ধরে খায়! সারাটা শরীর শিউরে উঠল।

স্নান ওইখানেই শেষ। প্রাণ নিয়ে পাড়ে উঠি। ছুটে গিয়ে সঙ্গীদের বলতে চাই ঘটনাটা। কিন্তু তাদের কাছে পৌঁছে কেন যেন চেপে যেতে হল সে সব কথা।

কিছুক্ষণ পরে আবার নদীর ঘাটে ফিরে আসি। দেখতে পাই সেই কুকুরটাই একটা ছোটো কবর খুঁড়ে কোন্ শিশুর শব বের করবার চেষ্টায় আছে। শ্মশানের প্রহরী ওরা, শব আহারে অভ্যস্ত—তাই বুঝি ওদের মুখ চোখ পোষা কুকুরের মতো আদুরে নয়। ওটাকে হাতে তুড়ি দিয়ে ডাকলেও বোধ হয় লেজ নাড়বে না আহ্লাদে ডগমগ হয়ে।

সেদিন আমাকে শিকার পেয়েও হারালো সেই কুকুরটা। আর আজ তিন তিনটে শিকার হারালেন এই সুদর্শন পাণ্ডা। ভয়ের স্মৃতি উপলক্ষ্য করে মনে একটা কৌতুকের সৃষ্টি হল পাণ্ডাকে দেখে।

মনে মনে বলি, সে দোষ ত আমাদের নয়, দাদা! তবু তিনি এমন ব্যর্থকামের মতো এই ঘাটের ধাপে বসে আছেন কেন!

কুকুরের ভয় মন থেকে যেতে না যেতে আবার পাণ্ডার ভয়ও দেখা দেয় মনে। এরা কি রকমের লোক কে জানে! পয়সার জন্য মানুষ খুনখারাপি করতেও পিছপা হয় না!

কুণ্ড থেকে উঠে পড়ি। পোষাকের ভিতর ঢুকে পড়ি। হঠা খেয়াল হয়, কুণ্ডের জলে নেমে তো কোনো ঠাকুরদেবতার নাম স্মরণ করা হয়নি। ব্রহ্মচারী ঐ যে আওড়াচ্ছে ভক্তিভরে মন্ত্র— পতিতপাবনী সুরধুনী গঙ্গে···আর সিদ্ধবাবা বলছে, 'তারা'··· 'তারা'···আমি তো কোনো ঠাকুরের নামই নিলাম না! না নিলেই বা ক্ষতি কি? আবার মনে হয়, নিলে যদি কিছু একটু ভালো হয় তাহলে নিলেই বা দোষ কি! আবার নামবো নাকি জলে!

নামতে যাচ্ছি দেখে ব্রহ্মচারী হেসে বলল, "এতে দোষ নেই। অঞ্জলিতে জল নিয়ে সূর্যের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে বলো, জবাকুসুম শঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্···ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্···।"

সংশয় পুরোপুরি দূর হয় না। তবু একটু সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে আমিও একেবারে ফাঁকি দিইনি। মনে মনে আওড়াই মা তারা, মা তারা, তোমাকে কিন্তু আসলে আমি অবজ্ঞা মোটেই করিনে, বাইরে যতই যা কিছু বলিনে কেন।

মনে মনে হতে থাকল, তারার উদ্দেশে মন্ত্র পড়লেই সব চেয়ে ভালো হত। কিন্তু সে ত আর জানা নেই! পাণ্ডাকে বললে নিশ্চয়ই মন্ত্র বলে দিত। হয়ত তার জন্য পয়সাও চাইত। তাতেই বা ক্ষতি কি। দু আনা পয়সার বিনিময়ে মনের শান্তি পাওয়া যেত দু টাকার! তবু মনকে বুঝিয়ে বলি, সূর্যবন্দনাও তুচ্ছ ব্যাপার নয়। সূর্যঠাকুর চুনোপুটি নন। তাঁর আলো আছে বলেই না তরুলতা পশুপাখি মানুষ সবার প্রাণ পলতে জ্বলছে কোন্ আদি কাল থেকে! ব্রহ্মচারীকে বললাম, "হ্যাঁ হে, সূর্যেরও খুব মাহাত্ম্য আছে, তাই না?"

ব্রহ্ম হেসে বলে, "কোন সংশয় আছে বুঝি? যাজ্ঞবল্ক্যের গল্প শোনোনি কখনও?"

উৎসুক হসে বলি, "কি গল্প, বলোনা শুনি!"

ব্রহ্ম বলতে লাগল, "কোনো এক অপরাধের দরুন গুরু শিষ্যকে আদেশ করলেন, 'তুমি চলে যাও এক্ষুনি। আর যাবার আগে সকল বিদ্যে আমাকে ফেরত দিয়ে যাও, যে বিদ্যে আমি এতকাল ধরে তোমাকে শিখিয়েছি!'

নিজের পক্ষে খারাপ হলেও শিষ্য গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করতে পারলেননা। গুরুর বিদ্যে গুরুকে ফেরত দিলেন।

কিন্তু বিদ্যে ছাড়া মানুষ যে পশুর সমান। এখন শিষ্য কার কাছে যাবেন আবার বেদ অধ্যয়নের জন্য!

ভাবেন আর ভাবেন। আকুল হয়ে ওঠেন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল।

'ঋগ্‌ভিঃ পূর্বাহ্নে দিবি দেব ঈয়তে, যজুর্বেদে তিষ্ঠতি মধ্যে অহ্নঃ।
সামবেদেনাস্তময়ে মহীয়তে, বেদৈরশূন্য স্ত্রিভিরেতি দেবঃ॥'

বললাম, "কি বললে, কিছুই ত বুঝতে পারলাম না বাবা!"

ব্রহ্ম বলল, "কি করে বুঝবে, দেবভাষা বুঝতে পারলে যে দেবতার উপর শ্রদ্ধা এসে যাবে! এ জন্যই ত আজকাল কেউ কোন ভাষা শিখতে চায়না!"

বলি, "সে সব বক্তৃতা রেখে এখন এই শ্লোকের অর্থটা ক্লিয়ার করে দাও!"

ব্রহ্ম বলে, "এই স্বয়ং প্রকাশ সূর্যদেব পূর্বাহ্ণ ঋগ্‌বেদে ভূষিত হয়ে গগনে উদিত হন। মধ্যাহ্নে অধিষ্ঠান করেন যজুর্বেদে আর সন্ধেবেলায় শোভিত হন সামবেদে। ইনি ত্রিসন্ধ্যা বেদপূর্ণ থাকেন। এঁর কাছেই বেদবিদ্যে শিখবেন আবার যাজ্ঞবল্ক্য' এই স্থির করে আরম্ভ করলেন তিনি সূর্যের আরাধনা। সূর্য তাঁর আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়েছিলেন আর বাজিরূপ ধারণ করে তাঁকে বেদবিদ্যা শিখিয়েছিলেন তবে ত আজ আমরা বেদজ্ঞ যাজ্ঞবল্ক্যের নাম কীর্তন করি!

ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মনে মনে ভাবি, খুব কাছাকাছি থাকি বলেই তোমাকেও আমরা চিনতে পারিনে। তোমার মধ্যে এই দেবধর্মের প্রতি আগ্রহ ভগবান দিলেন, আর আমাদের কেন যে বঞ্চিত করলেন, সে কথার উত্তর খুঁজে পাইনে। ভগবান যদি সকলের, তাহলে তিনি এমন পক্ষপাতিত্ব করেন কেন?

সিদ্ধবাবা ঠোঁট চেপে হাসে। সে হাসির যে অর্থ কি, সে বুঝে উঠতে পারিনে। তবু মনে হয়, হয়ত আমাকে বোকা ভেবেই ও প্রায় এ রকম থেকে থেকে হাসে। কিন্তু আমিই বা বোকামির এমন করলামটা কি!

চোদ্দো

মন্দির-চত্বরে না উঠেও কুণ্ডের পার দিয়ে বেরিয়ে আসবার পথ আছে। আমি আর সিদ্ধবাবা আসছি সে পথ ধরেই। পিছন থেকে ডাকল আবার ব্রহ্মচারী, "এসো, এসো, দেখে যাও আরেকটি প্রস্তরমূর্তি !"

প্রাঙ্গণেরই অন্য ভিটেয় একটি ছোট্টো মন্দির। তার ভিতরে কয়েকটি ছোটো ছোটো মূর্তি ! পাথরে খোদাই করা সপ্ত অশ্ববাহিত একটি রথচক্র দেখিয়ে ব্রহ্মচারী বলে, "চিনতে পারলে এ রথটির মালিক কে ?"

বললাম, "কোথায় মালিক ? কোনো মুখ তো দেখতে পাচ্ছিনে !"

ব্রহ্ম তখন হাত বুলিয়ে বুলিয়ে রথের উপরকার মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বুঝিয়ে দিয়ে শুধাল, "এবার ?"

বললাম, "আমরা কি করে বলব, আমাদের তো এ সব বিদ্যেয় অধিকার নেই !"

ব্রহ্ম বলল, "তোমাদের ওই এক কথা ! আসলে চেষ্টা নেই, ইচ্ছে নেই, সে কথাটাই বলো ! আগেকার দিনেই কি আর সব লোক সব বিদ্যে জানত ! কিন্তু তবু দেবধর্মের কাছাকাছি তারা থাকত। তাই তখনকার লোক এ মূর্তিকেও চিনতে পারত সূর্যমূর্তি বলে। তখনকার অশিক্ষিতরা পারত চিনতে, কিন্তু এখনকার শিক্ষিতরা পারছ না !"

আমি অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম। ব্রহ্ম মূর্তিটির স্কেচ্ করতে লাগল। সিদ্ধবাবা বেরিয়ে পড়ল।

সত্যি এ সূর্যমূর্তি ! আমার মন সার্থকতায় ভরে উঠল। চুপি চুপি জপ করতে থাকলাম, নমঃ সূর্যায়ঃ, নমঃ সূর্যায়···

হন্তদন্ত হয়ে এরই মধ্যে ছুটে এলেন চাণক্যপ্রতিম। এবার তাঁর পরনে লালপেড়ে তসর। খোলা গায়ে মোটা পৈতে নড়বড় করছে। কালোবোর্ডের গায়ে খড়ির শাদা আঁচড়ের মতো। মাথার ওপর চুলের গুচ্ছ স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি রক্তজবার দাক্ষিণ্যে। দুখানি খড়মও যেন পায়ে পরে নিয়েছেন আর হেঁটে চলছেন খটাস খটাস শব্দ তুলে। তাঁর হাতে জাল জাল সাজি—ফুল আছে তাতে ? দেখলাম যেন ঢলে পড়া ক'টি পাঁপড়ি। দু'পায়ে এগিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে আসেন—কি করবেন যেন স্থির করতে পারছেন না। আমাদের নীরবতায় বাধা দিতে ইচ্ছে নেই, অথচ না দিয়েও পারছেন না। তবু বললেন হঠাৎই, "স্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়েছেন আপনারা। আসুন, মায়ের আদিপীঠ দর্শন করবেন তো !"

বললাম, "সে আবার কোথায় ?'' ডানদিকে উঁচু ভিতের উপর মন্দির দেখিয়ে বলি, "এইখানেই ত মা থাকেন !"

বলেন, "হ্যাঁ, এখানে মা থাকেন বটে, কিন্তু এখানে তো প্রথমে ছিলেন না !"

বলি, "কোথায় ছিলেন তাহলে মা এর আগে ?"

"আপনারা জানেন না বুঝি ? শোনেননি মহামুনি বশিষ্ঠের নাম ? সেই বশিষ্ঠও সিদ্ধিলাভ করেছিলেন ওইখানে—শ্বেত-শিমূলের তলায় ! আসুন, সিদ্ধসাধকের সে পঞ্চমুণ্ডির আসন দেখিয়ে দিই আপনাদের !"

তারামন্দিরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে সিদ্ধবাবা শুধায়, "আর এই মন্দির মায়ের কোন্ পীঠ ?"

"এখনে মায়ের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে অনেক পরে। এ মন্দির তো সে দিনের। আপনারা দেখেননি এই মন্দিরের প্রতিমা ?"

"কোথায় আর দেখা হল ?"

উঠান থেকে প্রায় লাফ দিয়েই উঠলেন চাণক্যপ্রতিম। মন্দিরের উঁচু ভিতে পৌঁছে পিছনদিকে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ সম্মুখের দরজা খুলে গেল আমাদের চোখের ওপর। আমরা দেখতে লাগলাম তারা-মাকে। লালপাড় ছাইরঙা শাড়ি পরে মা বসে আছেন স্থির হয়ে—পায়ের কাছে ছোটখাটো একখানি ফুলের বাগান নিয়ে।

উঠনে দাঁড়িয়েই কপাল ঠুকলাম মায়ের মন্দিরের ভিতে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে নেমে এলেন চাণক্যপ্রতিম।

বলি, "বীরভূমের যত পীঠ দেখলাম সব পীঠেরই একটা না একটা কিংবদন্তী আছে—কোথাও দেবীর পায়েয় নলি পড়েছিল, কোথাও পড়েছিল কাঁকাল! এখানে কি পড়েছিল, সে কথাটা বলুন পাণ্ডাঠাকুর ?"

ব্রহ্মচারী বলল, "এটা তো পীঠ নয়, এটা হচ্ছে সিদ্ধপীঠ। তারাপীঠের সঙ্গে একান্ন পীঠের কোনো সম্বন্ধ নেই। এখানে তারার সাধনা করে যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন তাঁদের গৌরবেই এস্থান গৌরবান্বিত। কথাটা জানতে না বুঝি!"

অবাক হয়েই বললাম, "তাই না কি!"

ব্রহ্মচারী বলল, "ভাবছ এখানে আসতে তেমন পুণ্য হবে না!"

ব্রহ্মচারী বলল, "তা কেন ভাবব, আগে অন্য রকম ধারণা ছিল অবশ্য।"

"ভক্তি কমল, না বাড়ল ?"

বলি, "মাঝখানে রইল।"

চাণক্যপ্রতিম বলেন, "এই যে মন্দিরে মূর্তি আপনারা দেখলেন, এ কিন্তু মায়ের আসল রূপ নয়!"

"সে আবার কি ? আসল রূপ নয় ত, নকল রূপও আবার হয় নাকি ?"

"যে মূর্তিকে ধ্যান করতেন মহামুনি বশিষ্ঠ, সেই মূর্তিকেই তো আসল মূর্তি বলতে হবে!"

বললাম, "হ্যাঁ, তাই বলতে হবে। সে মূর্তি আবার কোথায়?" মনে মনে বলি, যত সব বুজরগি!

"সে মূর্তি আছে এই মূর্তির নিচে!"

বলি, "সে আবার কি? এই মূর্তির নিচে মানে মাটির তলায়?"

"না। মাটির নিচে নয়। এই মূর্তিটি সরিয়ে নিলেই সেই মূর্তির দর্শন হয়!"

সিদ্ধবাবা টিটকিরি দিয়ে বলে, "কি ভাবে দর্শন হয়!"

আমি ওর মুখে হাত চেপে বলি, "আমরা তাহলে আসল মূর্তি দেখতে পাবো তো? সেই বশিষ্ঠের আরাধিতা মূর্তি?"

গম্ভীর গলায় পাণ্ডা উত্তর দিলেন, "পাবেন! কিন্তু সে তো রাত্রি দ্বিপ্রহরের আগে সম্ভব হবে না!"

"রাত দুপুরে ছাড়া সম্ভব হবে না তার মানে?"

"তখনই সেই শিলামূর্তিকে স্নান করানো হবে কিনা! আর তাঁর ভোগও দেওয়া হবে। আজকে একটা বিশেষ তিথি পড়েছে কিনা তাই!"

বলি, "আমাদের ইচ্ছে ছিল এই বিকেলেই ফিরে যাই!"

"কিন্তু তাহলে আর সেই শিলামূর্তি দেখবেন কি করে!"

মনে মনে ভাবি, কত কাল পরে শিকার পেয়েছ বাবা! চট করে ছেড়ে দিলে যে বিলে টাকা উঠবেনা তেমন!

আবার সেই দরজা দিয়ে বাইরে এলাম। এই পথ দিয়েই আমরা প্রথম পাঁণ্ডার জালে ঢুকেছিলাম বুঝতে পারলাম।

চাণক্য-প্রতিমর পিছন পিছন আমরা তিনজন চলি। পশ্চিমের সূর্য আমাদের কপালে পড়ে ডিগবাজি খাচ্ছে। পাণ্ডার কপালে চন্দনের ফোঁটা শুকিয়ে ফাটো ফাটো। লম্বা লম্বা পা ফেলে

চলেছেন তিনি আর লম্বা লম্বা শ্লোক ছাড়ছেন থেকে থেকে। আমরা এক বর্ণ বুঝিনে ও সবের। জানি ব্রহ্মচারীর কথা। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়েও যান পাণ্ডা—ডানে বাঁয়ে পরিচিতরা ডেকে শুধায়, "হ্যাগো খুড়ো, খবর কি ?"

একটু হাসি ঠোঁটে কাঁপিয়ে পাণ্ডা বলেন, "ছাখছই ত! এঁরা এসেছেন অনেক দূর থেকে। একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দি। ক্ষ্যাপার নাম শুনে এসেছেন—স্থানে নিয়ে যাই!"

উত্তর হয়, "তা যান, তা যান।"

কুণ্ডের বাঁ পার ধরে আমরা সোজা চলি সামনের দিকে এগিয়ে। বাঁ হাতে কতকগুলো ঘর আছে পরপর। খড়ের, টিনের, টিনের, খড়ের। একটা ঘরের পিছনে আরেকটা। কোনো মিলমিছিল নেই। সামনের ঘরগুলোতে কোনো কোনোটাতে সাইনবোর্ড লাগানো। উল্লেখযোগ্য—বামাক্ষ্যাপার নামে কি একটা সঙ্ঘ। টিনের চৌচালার ভিতরে কি আছে দেখতে চেয়ে উঁকি দিলাম।

জানালার গরাদের ফাঁকে দেখা যায় ভিতরে একখানি ছবি। বেশ বড়। কাচের ফ্রেমে বাঁধানো। চিনতে পারি—এমন ছবি দেখেছি এর আগে কোনো বইএর পাতায়—সাধক বামাক্ষ্যাপার। এই ঘরেই কি তিনি বাস করতেন!

তালাবদ্ধ ঘর। ধুলোময়লা জমেছে বাইরে ভিতরে। দু' চারদিন ঝাড়মোছ হয়নি বোধ হয়। তা ছাড়া লোকজনই বা কোথায়! শুধাই পাণ্ডাকে, "কেউ আর থাকেননা এখানে এখন ?"

"না। ক্ষ্যাপার শিষ্যসেবক কেউ না। তবে এক বুড়ো আছে, ওই যে পিছনের ঘরটা দেখছেন ওটাতে থাকে। সাধু নয়, কিন্তু সাধুসন্তর খবর রাখে।"

এগিয়ে যাই আরও। সেই বুড়োকে খুঁজে দেখি। বুড়ো বাড়িতে নেই।

পাণ্ডা বলেন, "হয়ত ওই দোকানটাতে গিয়ে বসে আছে !"

বলি, "যে দোকানে বাদাম ভাজে ?"

"হ্যাঁ, একটাই তো দোকান। সেও চলেনা। মন্দিরে যাত্রী জুটলে তবে ত দোকান টি'কতে পারে! তা নইলে দেখছেন ত, এখানে লোকজনও খুব কম!"

বলি, "শ্মশানের আশেপাশেও শ্মশানেরই মতো!"

"কেন এ রকম বলুন ত ?"

"মায়েরই ইচ্ছে এখানে মানুষ বেশি থাকবে না।"

"তার মানে ?"

"মানে বুঝতে পারবেন—ওই যে মন্দিরের বাঁ দিকে নূতন বাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে, ও খানার দিকে তাকালেই!"

বলি, "সে আবার কি! বাড়িখানা তো সুন্দর বাড়ি। সামনে কি সুন্দর বাগান! দেখলে কার না চোখ জুড়োয়!"

পাণ্ডা হেসে বলেন, "মানুষের চোখ কি শুধু গাছপালা দেখেই জুড়োয়! মানুষও তো থাকা চাই!"

"ওই বাড়িতে কি মানুষ নেই তাহলে বলছেন ?"

"সে কথাই তো বলছিলাম। যে কেউ একজন ইচ্ছে করলেন এখানে এসে বসবাস করবেন, আর বাড়ি করলেন আর এসে গেলেন, তাহলেই হল না—তার আগে মায়ের আদেশ পাওয়া চাই। তা নইলে ভদ্রলোক কলকাতা থেকে এসে কত আশাভরসা নিয়ে বাড়িটা তৈরি করলেন, কিন্তু বাস করতে পারলেন কই! বাড়ি শেষ হতে না হতেই সংসারের লোকজন তাঁর শেষ হয়ে যেতে লাগল। শেষে তিনি নিজের প্রাণটা নিয়ে পালিয়েছেন।"

বলি, "এ তো বড় ভয়ঙ্কর জায়গা তাহলে। আপনারা আছেন কি করে ?"

পাণ্ডা মুখে গর্বের হাসি হেসে বলেন, "তাহলেই বুঝে দেখুন! মায়ের আশীর্বাদ আছে বলেই তো! আর ক্ষ্যাপা আমাদের মাথায়

নেহাৎ তাঁর পা ঠেকিয়ে গেছেন, তাই। নইলে আমাদের কি শক্তি, কি সাধ্যি বলুন!"

"ক্ষ্যাপাকে আপনি দেখেছেন?"

"দেখেছি কি! এই যে বললাম, ক্ষ্যাপা মাথায় পা ঠেকিয়েছেন। কত আদর করতেন! ছোটো ছেলের মতো খেলা করেছি ক্ষ্যাপার সঙ্গে আমরা। হয়ত বলতে পারেন এমন মহাপুরুষের সঙ্গ পেয়েও আমি এই ফুলবেলপাতা নিয়ে ছুটোছুটি করি কেন! কিন্তু জীব-সেবার জন্যই তো দেহ। এটুকু না করলে বেঁচেই কি লাভ! আমরা তো আর ক্ষ্যাপার মতো উচ্চকোটি সাধক নই। সাধারণ সংসারীই। তবে কি ছিটেফোঁটা কৃপাকণা আমদের মধ্যেই নেই! কিন্তু হৃদয়পদ্ম ফোটা চাই। শোনেননি সেই গানটা?

হৃদয়পদ্ম ফুটলে পরে এই ফুলে আর কি প্রয়োজন!

সিদ্ধ যে হয় তার কি লাগে ফুলপাতা আর ভজন পূজন!"

গানের সুরেই সুর করে কথাগুলো জানালেন আমাদের পাণ্ডাঠাকুর। গাইতে গাইতে চোখ দুটো তাঁর ছল ছল করে উঠল। কালো কদাকার কাঠখোট্টা মানুষের চোখেও এমন অশ্রু টলমল করতে পারে—দেখতে পেয়ে অবাক হলাম।

পিছনের নিচু জমিতে একখানা পাকা বাংলোমতো বাড়ি। জিজ্ঞেস করি, "ওটা কিসের জন্য?"

"যাত্রীদেরই বিশ্রামশালা। বিশেষ বিশেষ যাত্রী কেউ যখন আসেন। এইত কিছুদিন আগে এসেছিলেন 'আনন্দময়ী মা'। ওইখানেই ছিলেন তিনি। আপনারা তাঁকে চেনেন? দেখেছেন?"

বললাম "না। তবে তাঁর নাম শুনেছি। আমাদের এক বন্ধুর ঘরে মায়ের ছবি দেখেছি।"

পাণ্ডা আনন্দময়ী মায়ের গুণকীর্তন করতে লাগলেন।

সিদ্ধবাবা বলে, "সব জায়গাতেই সাধারণ আর বিশেষ আছে

বাবা! যেখানে মানুষ শেষবারের মতো পৌঁছোয় সেই ত শ্মশান! শুনেছিলাম শ্মশানে এলে রাজায় আর ভিখিরিতে তফাৎ থাকেনা, কিন্তু সে ধারণা দূর হল! শ্মশানের মাঝখানেও আবার এক ঘর তৈরী করেছে বিশেষ মানুষের জন্য—ত্যাখো মজাটা! হায় রে অজ্ঞান মানুষ!"

আমি বললাম, "ভূল বুঝলে তুমি। এখানে তো আর অর্থ বিত্তে বিশেষ মানুষ নিয়ে কথা হচ্ছে না। সাধনমার্গে বিশেষ মানুষের কথাই হচ্ছে।"

সিদ্ধবাবা বলে, "ওই হল! সংসার আর সাধনমার্গে তাহলে তফাৎটা রইল কি?"

ব্রহ্মচারী বলে ",কেন ওসব কচকচি আবার শুরু করেছ? ও সব নিয়ে তখন আলোচনা করো যখন একজন হবে সংসারে শ্রেষ্ঠ আরেকজন হবে সাধনমার্গে শ্রেষ্ঠ। অনধিকার চর্চা শোভা পায়না তোমাদের।"

সিদ্ধবাবা একা একাই হাসল। কিছু বললনা।

আরেকটু এগিয়ে চলি সম্মুখে। বাঁ হাতে ঘুরে দাঁড়াই। ডানদিকে দুতিনটে ছোটো ছোটো মন্দির। সামনে জায়গাটা একটু নিচু—কি রকম যেন ভিজে স্যাঁৎস্যাঁতে। নদীর বানে ডুবেছিল নিশ্চয়। কাদার মধ্যে পায়ের চিহ্ন রয়েছে মানুষের আর জন্তু জানোয়ারের। জঙ্গল শুরু হয়েছে এখান থেকেই। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে চিতার স্মৃতি। একটি দুটি নয়, অসংখ্য চিতা—পোড়া আধপোড়া কাঠ, বালিশের তুলো ইত্যাদি ছড়িয়ে আছে—সে নাকি প্রায় এক মাইলেরও বেশি জায়গা নিয়ে।

তা না হলে আর মহাশ্মশান! বামাক্ষ্যাপার সাধনার স্থান যে!

পনেরো

ছোটো একখানা ঘর। উচ্চতা হাঁটু পরিমাণ। ছাগলের নয় তো! তাই বা কি করে হবে! জঙ্গলের মধ্যে ছাগল রাখলে শেয়ালে টেনে নিয়ে যাবে না? তবে কি ছোটোদের খেলাঘর এটি! সেই বা কেমন করে হয়! বড়োদের গা ছমছম করে যেখানে দাঁড়ালে, সেখানে ছোটোরা আসবে খেলা করতে? অসম্ভব।

পাণ্ডাঠাকুর বললেন, "এক সাধকের কুটীর ছিল এখানি। শুধু তাঁর বসবার মতো জায়গারই দরকার ছিল। আসনের জন্য যতটুকু চাই, তার বেশী নয়। দিনরাত্রি ধ্যানমগ্ন থাকতেন তিনি।"

"গেলেন কোথায়?"

"সে কথা কি ওঁরা বলে যান কাউকে! এখানকার কাজ হয়ে গেলে অন্য কোথাও চলে যান। এখানে আসেন গুরুর নির্দেশে মায়ের আদেশ পেয়ে। আবার চলেও যান আদেশ পেলেই তবে। যে জন্যে এসেছিলেন সে কাজ হয়ে গেছে তাই হয়ত চলে গেছেন।"

ঘর খানির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবান্তর হয় আমার। বলি, "সত্যিই সাধক চলে গেলেন, কিন্তু পড়ে রইল তাঁর স্মৃতি পিছনে। তাঁর সাধনখানি জেগে রইল শ্মশানের মনে। আমরা না দেখলেও শ্মশান তাঁকে নিশ্চয়ই দেখতে পায়!"

একটু দূরে একটা বাঁশের মাচা। মাচার ওপর স্তূপাকার খড়। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখতে পাই স্তূপটার একদিকে একটা দরজামতো কি রয়েছে। না খড়ের গাদার নিচে আবার দরজা

থাকবে কেন! এ মনের কল্পনা। ঘর থেকে এসেছি বলে সব সময় ঘরের ছবিই মনে ভাসে। কিন্তু এমন জঙ্গলের মধ্যে খড়ই বা রাখতে যাবে কোন গেরস্থ! তা ছাড়া ওপরটা গাছের ডালে ডালে ঢাকা। গাছের নিচে খড়ের গাদা করলে বৃষ্টির জল গাছের ডাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে খড়ের বারোটা বাজিয়ে দেবে যে!

আরেকটু কাছে এগিয়ে গিয়ে ও পাশটা লক্ষ্য করে দেখি, হ্যাঁ বাঁশের কঞ্চি দিয়ে দেওয়া ছিটে বেড়ার মতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। পাণ্ডাঠাকুরকে জিজ্ঞেস করি, "এটা কি মশায়।"

বলেন, "এও একখানি সাধন কুটীর।"

সাধন কুটীর! এ যে আমাদের শিকারীর টঙ্গীর মতো দেখতে। হঠাৎ মনে পড়ল ছেলেবেলার দেখা এই ধরনের ঘরের কথা। রঘুনন্দন পাহাড়ের গায়ে যারা আখের চাষ করে, তারা শূওর তাড়ায় রাত্রিকালে ঐ মাচায় থেকে। বুনো শূওর শিকারও করে ওই ধরনের টঙ্গীতে থেকে।

পাণ্ডা বলেন, "এতেও শিকারীই থাকেন। তবে শূওর শিকার করবেন না তিনি। মনের ষড়রিপু শিকারের জন্য ওৎ পেতে বসে থাকেন দিবারাত্রি।"

সিদ্ধবাবা বলে, "ষড়রিপুকে শিকার করে ফেললে মানুষটার আর থাকেই বা কি? জীবনটা তো ষড়রিপুকে আশ্রয় করেই!"

ব্রহ্মচারী ধমক দিয়ে বলে, "আবার অনধিকার চর্চা শুরু করেছ তুমি। ষড়রিপু শিকার করতে যারা পারে তারাই নিজের নিজের মনুষ্য মূর্তিটাকে দেখতে পায়। এমনি যাদের মানুষ বলছ তাদের কি কারও হুঁশ আছে এতটুকু।"

বলি, "ও সব তত্ত্বকথা এখন রাখো বাবারা। শুধিয়ে নিয়ে নিই সাধকের কথা পাণ্ডাঠাকুরকে।"

"ইনি কি বাইরে আসেন না কখনও?"

"আসেন। তবে এসেও না-আসেন।"

"সে আবার কি ?"

"সকালে আর বিকেলে তুবার স্নান সেরে যান কুণ্ড থেকে। ততক্ষণই তাঁকে বাইরে দেখা যায়। অন্য সময় পাবেন না।"

সব সময় না পেলেও একটা বিশেষ সময়ে তাঁকে দেখতে পাবো, এই কথা শুনে মনটা খুশি হয়ে উঠল। ভাবলাম, বশিষ্ঠকে দেখিনি, বামাক্ষ্যাপাকে দেখিনি, তবু তো একজনকে দেখতে পাবো যিনি এই মহাশ্মশানে বসে সাধন করছেন। অন্ধকারে বসে প্রার্থনা করছেন —তমসো মা জ্যোতির্গময়।

শুধাই পাণ্ডাকে, "কোথা থেকে এই সাধক এসেছেন জানেন কিছু ?"

"না। ওঁরা তো কাউকে কখনও বলেননা, কোথা থেকে এলেন আর কোথায় যাবেন। এঁরা যে সংসারীদের উল্টো। আপনারা পড়েননি গীতার সেই শ্লোকটা :—

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ।"

সিদ্ধবাবা চাণক্যপ্রতিম পাণ্ডাঠাকুরের দিকে তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে।

ব্রহ্মচারী বাংলা অর্থ বলে দেয়, "যখন সকলে ঘুমোয় তখন সাধকরা জেগে থাকেন, আর যখন সকলে জেগে থাকে তখন তাঁরা যোগনিদ্রায় মগ্ন হন।"

শুধুই পাণ্ডাকে, "তবু তো একটা কিছু শুনেছেন যে অমুক জায়গা থেকে উনি এসেছেন, অমুক তাঁর নাম ?"

পাণ্ডা বলেন, "শুনেছি যা তা হচ্ছে এই যে ইনি বাংলাদেশেরই কোনো ইস্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। হঠাৎ বৈরাগ্য আসে তাঁর মনে আর তিনি বেরিয়ে পড়েন। আর কিছু জানিনে। আর যা বলেছি তাও সত্যি কিনা সে কথা আমি বলতে পারিনে। আমার যেন তার জন্য আবার অপরাধ না হয় !"

আমরা যেন আশ্চর্য হয়েছি—চোখেমুখে আমাদের এমনি ভাব দেখে পাণ্ডা বলেন, "এই পীঠ সিদ্ধপীঠ। এ স্থানটি তো শুধু এই একটি কালের নয়। মনে করে দেখুন রাম লক্ষ্মণের কুলপুরোহিত সেই যে বশিষ্ঠ ছিলেন, তিনিই নাকি প্রথম সিদ্ধিলাভ করেন এই তারাপীঠে। তারাপীঠের তারা মায়ের বর দেওয়া আছে—এখানে পর পর এগারো হাজার সাধক সিদ্ধলাভ করবেন।"

এক নয়, দুই নয়, একশো দুশো এগারোশো নয়, এগারো হা জা র !

শুধাই, "এ পর্যন্ত কতজন সিদ্ধিলাভ করেছেন এখানে ?"

"তা কি করে জানব বলুন ! আমরা আর কদিন জন্মেছি এই সংসারে ! নাম শুনেছি শুধু বশিষ্ঠের, রাজা রামকৃষ্ণের, আনন্দনাথের, মোক্ষদানন্দের, বামাক্ষ্যাপা আর তারাক্ষ্যাপার !"

"আর ? আর কারও নাম শোনেননি ?"

"না।"

"তা হলে ? এখনও যে বাকি রইল দশ হাজার নশো চুরানব্বই জন !"

পাণ্ডা বলেন, "আপনাদের হিসেব ঠিক নাও হতে পারে। আমরা কি আর সকলের নাম জানি ! নানা কালে আরও নানা সাধক হয়ত এখান থেকে সিদ্ধলাভ করে গিয়েছেন, যাঁদের নাম কোথাও লেখা হয়নি। শুধু বশিষ্ঠ আর তাঁর পরবর্তী কয়েকজনের বিষয়েই আমরা তবু কিছু জানতে পারি।"

•

"কি জানেন বলুন না একটু শুনি !"

"বশিষ্ঠ ছিলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। তাঁর দীক্ষা হয়েছিল তারামন্ত্রে। কামরূপ কামাখ্যায় কঠোর অপস্যা করেছিলেন মন্ত্রসিদ্ধির জন্য। সেখানে হলনা সিদ্ধিলাভ। মায়ের আদেশে গেলেন

চীন দেশে। নিজে বানিয়ে বলছি মনে করবেননা। প্রমাণ রয়েছে পুঁথিতে। আপনারাও খুঁজে পাবেন চীনাচার-তন্ত্রে ঃ—

তেতো গত্বা মহাচীন দেশে জ্ঞানময় মুনি।

সেখানে গিয়ে আবার আদেশ পেলেন ভগবান বুদ্ধের—তারাপীঠে যাও। উগ্রতারার সাধনা করোগে মহাশ্মশানে বসে সেখানকার শ্বেত শিমূলের তলায়! তবে ত তিনি এলেন! আর তাঁর স্মৃতিকে ভর করে আপনারা এলেন আজ!"

পাণ্ডা আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে দেখালেন "ওই-যে বশিষ্ঠের মন্দির দেখুননা। আর যে কুণ্ডে আপনারা স্নান করলেন, সেই কুণ্ডটিকেও কেউ কেউ বশিষ্ঠকুণ্ড বলে থাকেন। যদিও তারামায়ের কুণ্ড বলেই ওটি পরিচিত।"

"আসুন, দেখবেন বশিষ্ঠের মন্দিরে রাখা আছে মায়ের পদচিহ্নশিলা।"

পাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। শুধালাম, "কোথায়—দেখতে পাচ্ছিনে ত!"

"ঐ যে জবাফুলের তলায়!"

কে যেন বলেছিল তারাপীঠের শশ্মানে বশিষ্ঠের সিদ্ধাসনের বৈশিষ্ট্য আছে। সে হল এই যে বশিষ্ঠের আসনে আর কেউ বসতে পারেনা। সে খবর পাণ্ডাঠাকুর জানেন কিনা শুধিয়ে দেখা যাক!

বলি, "আচ্ছা ঠাকুরমশায়, বশিষ্ঠের সিদ্ধাসনে আর কেউ বসেছেন কখনও?"

জিভে কামড় দিয়ে পাণ্ডা বলেন, "কার এমন বুকের পাটা? এমন ধড়ে কার পাঁচটা মাথা যে বশিষ্ঠের আসনে বসতে যাবে?"

"ক্ষ্যাপা বসেছিলেন?"

"ক্ষ্যাপার কথা ছেড়ে দিন! ক্ষ্যাপাতে আর বশিষ্ঠতে তফৎটা কি ছিল বলুন?"

বলি, "না, না, সে তফাতের কথা বলছিনে। জানতে চাইছি ক্ষ্যাপা বসেছিলেন কিনা ?"

"এমন কথা বলবেন না। এ রকম বললে ক্ষ্যাপাকে ছোটো করা হয়। ক্ষ্যাপা বসলেও বসেছেন, না বসলেও বসেছেন। বশিষ্ঠের কথা শাস্ত্র ঘেঁটে বের করতে হয়, এমনিতে আর ক জনে জানেই বা! কিন্তু ক্ষ্যাপার নাম শুনেই তো এখন যত যাত্রীরা এখানে আসে!"

"তাহলে বামার পরে আর কোনো সাধক সে আসনে বসতে সাহস করেননি ?"

"করেছিল এক লোভী ব্রাহ্মণ সে দুঃসাহস! তেমনি তার শাস্তিটাও হয়েছিল!"

"কি শাস্তি হয়েছিল ? আর সে লোভী ব্রাহ্মণই বা কে ? কোথা থেকে তিনি এসেছিলেন জানেন কিছু ?"

"সে সব কথা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। এখন চলুন ঘরে ফিরে যাই। খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রামে শুয়ে বসে শুনবেন সে গল্প!"

"না না, এখনই বলুন। বিশ্রাম বিশ্রাম একেবারেই বিশ্রাম। তখন আর গল্পসল্প ভালো লাগবেনা। আধখানা শুনতে না শুনতেই চোখ লেগে যাবে। তার চাইতে এখনই যথাস্থানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনে নিই গল্পটা! ঘরে পৌঁছলে কি আর শ্মশানের মন থাকবে!"

"তবে শুনুন। সত্যি মিথ্যে জানিনে। নিজের চোখে তো দেখিনি। পরের মুখে যেমন শুনেছি তেমিন বলছি!"

"ঠিক আছে! শুরু করুন। যা শুনেছেন তাই বলুন।"

"তাঁর নাম জানিনে। বামার কাছে তিনি হেয় হলেও আমাদের চাইতে তো অনেকখানি এগিয়েছিলেন! তা না হলে ঘরসংসার ছেড়ে এই শ্মশানে আসবেন কেন! কিন্তু লোভটা একটু বেশি

করেছিলেন! শুধু লোভ নয়, সাধনপথে এগিয়েছেন বলে হয়ত গর্বও ছিল মনে। কিন্তু মানুষের শক্তিই বা কতটুকু আর তার গর্বের দৌড়ই বা কি হবে ভেবে দেখুন!"

বলি, "ও সব তত্ত্বকথা রাখুন। সেই ব্রাহ্মণের গল্পটা বলতে বলতে এগিয়ে চলুন ঘরের দিকে।"

"তিনি এসে বসলেন পঞ্চমুণ্ডীর আসনে। যারা দেখল তারাই তাঁকে নিষেধ করল কিন্তু তিনি শুনবেন কেন। তিনি তো আর চুনোপুঁটি নন। চক্ষু বুজে ধ্যানস্থ হলেন সেই আসনে সমগ্রীবকায় হয়ে বসে!"

সিদ্ধবাবা মাঝখানে কানে কানে বলল, "শুনলে তো কথাটা সমগ্রীবকায়! এই চাণক্যও কম পাত্র নয়।"

এর মধ্যে আরও কি কি বলে ফেলেছেন পাণ্ডাঠাকুর। যাকগে। তার জন্যে আর পীড়াপীড়ি করলাম না। যেমন বলছেন শুনে যেতে লাগলাম।

"একটি সাপ এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলো যেমন করে আমরা একটা নলীতে সুতো পেঁচাই, ঠিক তেমনি করে ব্রাহ্মণকে পেঁচাতে লাগল সেই সাপটা। পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে তাঁর পা থেকে গলা অবধি এসে পৌঁছল। শুধু ফণাটি বিস্তার করে রাখলো ব্রাহ্মণের কপালের ওপর। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণকে চাপতে লাগলো। এমনই সে চাপ—যেন কেউ ভিজে কাপড় নিঙড়ে নিঙড়ে জল ফেলতে চাইছে। সাপের মতলব ব্রাহ্মণের শরীরের সব রসরক্ত বের করে ফেলে।"

"তারপর? ব্রাহ্মণ তবু বসে রইল?"

"পাগল! প্রাণ যায় যায় হয়েছে দেখে তিনি আসন থেকে উঠে পড়লেন। কিন্তু এই উঠে পড়া যে কতটুকু শক্ত সে তো সাধনপিপাসী ছাড়া বুঝবেনা! দুটো পয়সার জন্য আমার আপনার যে রকম পিপাসা, একটা যুবতী মেয়ের জন্য একটা

যুবকের যেমন এক একবার প্রাণ যায় যায় হয়, তেমনি অবস্থাও হয় সাধকের তাঁর সিদ্ধিলাভের জন্য। রামকৃষ্ণ দেবের গল্প শোনেননি? সেইযে বলেছেন ঈশ্বরের জন্য আকুলতা ব্যাপারটা কি—সেটা হল একটা মানুষকে জলের তলায় ঠেসে ধরলে তার যেমন আঁইঢাই অবস্থা হয় ঈশ্বরপাগল মানুষদেরও দেখবার জন্য তেমনি আকুলতা জাগে!"

বলি, "ব্রাহ্মণের কি হল, আগে সে কথা বলুন।"

কি আর হল শেষপর্যন্ত উঠেই গেলেন তিনি। কারণ এ যে হতে পারেনা। বশিষ্ঠের আসনে বসতে হলে তাঁর মতো অতখানি সাধন থাকা দরকার যে! ব্রাহ্মণের হয়তো ততখানি ছিলনা!"

কথা শেষ করে পাণ্ডাঠাকুর আমাদের দিকে তাকালেন। তাঁর বুঝি সন্দেহ হল যে তাঁর কোনো কথাই আমরা বিশ্বাস করিনে। তাই তিনি বললেন, "সন্দেহ হচ্ছে আমার কথায় আপনাদের, তাই না? কি করেই বা নিঃসন্দেহ হতে পারেন—জন্ম নিয়েছেন এই বিজ্ঞানের যুগে! ইস্কুলে কলেজে পড়েছেন। জ্ঞান আপনারা অর্জন করেছেন একটা বাঁধা পথে। কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞানের পথ কত আছে তার কি হিসেব কেউ পেয়েছে! মহাজ্ঞানী মহাসন্তদের নাম করুন আর আমাকে বলুন দেখি তাঁদের কজন কটা ইস্কুলে পড়ে পরমকে জানতে পেরেছেন?"

বলি, "আপনি মশায় জ্ঞানবৃদ্ধ, তা ছাড়া ক্ষ্যাপার সাক্ষাৎ শিষ্য। আপনার সঙ্গে আমাদের তুলনা করছেন কেন?"

বললেন, "না, না, সে কথা বলছিনে। এই ক্ষ্যাপার কথাই ধরুননা—সেই যে তিনি ছেলেবেলায় ইস্কুলে যেতে যেতে হঠাৎ বসে পড়েছিলেন এক গাছতলায় আর বলেছিলেন—ইস্কুলে আমি পড়বনা। ঠাকুরের পুজো করবো! তাইতো করলেন শেষ পর্যন্ত!"

বলি, "ক্ষ্যাপার কথা ছেড়ে দিন..."

কথাটা শেষ না করতে দিয়েই পাণ্ডা বললেন, "এ কি বলছেন, ক্ষ্যাপার নাম শুনে ক্ষ্যাপার স্থানে এসেছেন, ক্ষ্যাপার কথা বাদ দিলে আর থাকে কি ? ক্ষ্যাপা বলেছিলেন, তোরা ঘর কর আর দর কর আর সংকে সার কর, আমি ওই সং সাজবোনা। সত্যি সত্যি সাজলেন না। যেমন এসেছিলেন তেমনি গেলেন—আগাগোড়া নিরাভরণ।"

বললাম "দেখুন, এমন হওয়াটা ঈশ্বরেরই ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। মানুষ চেষ্টা করলে কি ত্যাগী হতে পারে ? বেদ বেদান্ত তো কত লোকে পড়ে, তাঁদের সোহহং ভাব আসে কি ? তাঁরা কজনই বা নিষ্কাম হতে পারে ? আসলে যাঁর হবার তিনিই হন, অন্যে কেউ হতে পারেনা !"

পাণ্ডা বললেন, "ক্ষ্যাপার বাবাও ছিলেন 'তারা' বলতে অজ্ঞান। তিনি ত গরীব ছিলেন খুব ! তাই অভাব অনটনের যন্ত্রণাও ছিল। ক্ষ্যাপার মাকেই সেটা বেশি করে টের পেতে হত। তাই মায়ের ইচ্ছে ছিল যে বামাকে তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে উকিল হাকিম বানাবেন, তাহলেই সংসারটা একটু সুন্দর হয়ে উঠবে। ক্ষ্যাপার মায়ের সেই ইচ্ছা জানতে পেরে ক্ষ্যাপার বাবা হেসে হেসে গান ধরেছিলেন,

ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি করো মা
লোকে বলে করি আমি !"

ষোলো

বাধা দিতে চাইলাম পাণ্ডার বক্তৃতায়। ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা করে করে তিনিই ক্ষেপে গেছেন একেবারে! যে কথাই বলা যাক তাতেই ক্ষ্যাপার কথাই এসে পড়ে। টুক্‌রো টাক্‌রা প্রশ্ন এটা ওটা আমরা করে চলেছি, কিন্তু পাণ্ডা আর কোনো কিছুর উত্তর না দিয়ে বলে চলেছেন ঃ—

"বামার মায়ের কথা ফললনা ত! ফলল তাঁর বাবার কথাই। ইস্কুলে পড়ে পণ্ডিত হলনা ছেলে। তারা তারা করেই পাগল হল। তারার ইচ্ছাতেই ডুবলো সে তারার নামের সাধনায়। তা নইলে পণ্ডিত বামাকে দেখতে আপনারা কেউ আসতেন আজ এত কষ্ট করে! কত পণ্ডিত তো রয়েছে আপনাদের ঘরের আশেপাশে। কই তাদের তো দেখতে যান না। জানতে তো যাননা তারা কে, কোথায় দাঁড়াতো, কোথায় বসতো? যদি আজ বামাকে দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন কার কথা আমি বলছি। চোখে না দেখলে ত আপনারা আজকাল আর কিছুই বিশ্বাস করবেননা। রাত্রিবেলা যে আকাশে এত তারা ফোটে দিনের আলোতে আপনারা সে কথাও ভুলে যান। আসুন, আসুন, আমার সঙ্গে—দেখিয়ে দিই সেই সাপ…।'

কথা বলতে বলতে পাণ্ডার চেহারা কি রকম হয়ে গেল। মনে হয় যেন কোনো অদৃশ্য শক্তি ভর করেছে তাঁর শরীরে। ঠিক এই মুহূর্তে তাঁকে আর চাণক্য বলে বিদ্রূপ করা যায়না যেন। তা ছাড়া এখনই তিনি আমাদের নিয়ে যাচ্ছেন একটা ভীষণদর্শন সর্পের সম্মুখে! সাপুড়ের ঝাঁপির দাঁতভাঙা সাপ

দেখলেই ভয়ে শরীর শিউরে ওঠে, আর এ যে একেবারে জঙ্গলের!

রোমাঞ্চ হল। তবু কৌতূহল দুর্নিবার। অনুসরণ করে চলি পাণ্ডাঠাকুরকে ভয়ে ভয়ে। জ্যান্ত সাপের কাছে যাচ্ছি। খেলা নয়! যদি এসে ছোবল দেয়—তাহলেই তো হয়ে গেল! এত পথ আসতে যে সাহস মনে মনে সঞ্চয় করে এসেছি সব যেন এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল বুকের ওই এতটুকুনি ধুকধুকিতে। ছেলেবেলা মা আস্তিকমুনির দোহাই দিয়ে সাপের ভয় তাড়াতেন। আমিও মনে মনে নিতে লাগলাম আস্তিকমুনির নাম।

বেশি দূরে নয়। এই কয়েক পা এগিয়েই।

ছোট্ট একটি মন্দির। কাঠের জোড়াকপাট লাগানো। পাণ্ডা বললেন, "এই হল ক্ষ্যাপার সমাধি। সর্পটা এখানেই থাকে সব সময়।"

শুধাই, "এখনও আছে?"

"আছে বৈ কি, কত লোক দেখে যায় এসে এসে। দেখুননা। ভয় নেই। যান এগিয়ে যান, আরও কাছে যান!"

উঁকি দিয়ে দেখি—একটা মোমবাতি জ্বলছে। ভয়ের মধ্যেও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার জেগে উঠলেন তাঁর সেই অমর ছত্র দুটি নিয়ে,

"যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি
আশুগৃহে তার জ্বলিবেনা আর নিশীথে প্রদীপ ভাতি"

কিন্তু এখানে তো মনের হরষে জ্বালায়নি। ভয় পাওয়া মানুষ এই বাতি জ্বেলে গিয়েছে ভয়ংকর ভুজঙ্গকে বশীভূত করবে সেই হয়ত। অথবা সমাধিস্থ সাধকের সম্বর্ধনা চলছে নীরব এই আলোর শিখায়!

কিন্তু সাপটা কই? শুধাই, "ও ঠাকুরমশায়, বলেছিলেন যে সাপ?"

মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করে দাঁড়াই মন্দিরের ডান দিকে। বলি, "আমাদের ভয়ে কি সাপটা পালিয়ে গেল?"

পাণ্ডা দু' হাতে কপাটটা খুলে দিলেন। হঠাৎই চোখে পড়ল বিস্তৃত ফণাটা সাপের। একটু পিছিয়ে এলাম! শিবলিঙ্গের দিকে ফোঁস করে আছে কোমরে ভর দিয়ে একেবারে সোজা সটান। কিন্তু রক্ষে যে, সাপটা রক্তমাংসের নয়।

পিতলের? না কি ব্রোঞ্জের? যিনি তৈরি করেছেন তাঁর উদ্দেশে প্রশংসায় মুখর হল অন্তর। কাঁচা শিল্পীর হাত দিয়ে এমন প্রতিকৃতি বেরতে পারবেনা। বলি ব্রহ্মচারীকে, "পারো এ রকম একটা সাপ তৈরি করতে?"

"কেন, তোমার সমাধিমন্দির তৈরি শেষ হয়েছে নাকি?"

পাশেই ডানহাতে মন্দিরের সম্মুখে একটুখানি বাঁধানো জায়গা। ইচ্ছে করলে বসে গল্প করা যায় ক জন মিলে। তারই সম্মুখে একটা হাড়িকাঠ পোঁতা। পাণ্ডাঠাকুর ওটা ছুঁয়ে হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "কত রোগী এসে ধর্ণা দিতো বামার পায়ে। বামা অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়ে বলতেন, এখানে কেন এইছিস্ শালারা, যা না শিমূলতলায়—কাতরার তলার মাটি তুলে খে গে যা!"

আমরা তিনজনে একসঙ্গে হেসে উঠি। তাকাই একজন আরেকজনের মুখের দিকে। মানে—এমন অদ্ভুত কথাও মানুষ বলে থাকে!

তবু ওরা দুজন একটু এগিয়ে যেতেই আমি একটুখানি মাটি তুলে নিই হাড়িকাঠের গোড়া থেকে। ওরা দেখতে না দেখতে মুখে দিয়ে ফেলি। বুকের একটা ব্যথায় অনেক কাল কষ্ট পাচ্ছি। ডাক্তারি, কবরেজি, হোমিওপ্যাথি, বায়োকেমিক—কোনো ওষুধ

বাকি নেই। এই মাটি একটুকু খেলে যদি অসুখ সেরে যায়, তাহলে তা খেতেই বা আপত্তি কি ? কেউ ত আর দেখছেনা আর জানছেনা যে আমি এই নোংরা শ্মশানের মাটি মুখে দিচ্ছি !

কিন্তু মাটিটুকু জিভে পৌঁছতেই ঘেন্নায় সারা শরীর আমার শিউরে উঠল। শুধু ঘেন্নাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও দেখা দিল মনে। এ আমি কি করলাম ? মুখটা না ধুলেই নয় ! কিন্তু জল পাবো কোথায় ? আর হঠাৎ মুখ ধোবার জন্য পুকুরে ছুটলে ওরাই বা ভাববে কি ? যতটা সম্ভব মুখ থেকে মাটিটুকু থুক্ থুক্ করে ফেলে দিলাম। তবু নিঃশেষে ফেলা তো হলনা। দাঁতে দাঁত লাগতেই কড়্ কড়্ করে ওঠে। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল। মনকে সান্ত্বনা দিই, গলার তল হয়নি এক কণা মাটিও, তবু মন কি তা মানে, না শোনে ! কেবলই বলে কানে কানে ছেলেবেলায় পড়া সেই গল্পটা —এক বদরী গাছের তলায় একটা লোকের কলেরা হয়েছিল। তারপর সেই গাছের তলা থেকে এক পথিক বদরী কুড়িয়ে খেয়েছিল। সেই পথিকের কলেরা হয়েছিল আর সে মারা গিয়েছিল। রোগের বীজাণু বিশেষ করে কলেরার বীজ বহুকাল ধুলোবালির সঙ্গে মিশে তাজা থাকে। এই হাড়িকাঠের গোড়ায় কত ধরনের রোগী এসেছে কত সময়ে আর তাদের রোগের বীজাণু ছড়িয়ে রেখে গেছে এখানকার মাটিতে, আর সেই মাটি আমি মুখে তুলে দিলাম। নিজের বোকামির জন্য নিজেকে শাস্তি দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কি শাস্তি দিই। তা ছাড়া এই যে মন খুঁৎখুঁৎ আর দুশ্চিন্তা সে কি শাস্তি ছাড়া অন্য কিছু ! একটা মুহূর্তে মানুষের মন কোথা থেকে কি হয়ে যায় অবাক হয়ে ভাবতে থাকি !

আমার গলায় কি যেন কিলবিল করতে থাকে। যেন এক্ষুনি বমি ঠেলে বেরুবে। দু একটা শুকনো উদ্‌গারও উঠল। সে খবরটা গোপন রাখতে চেষ্টা করি আমি। সঙ্গীদের পিছু পিছু পথ এগিয়ে যাই চাদরে মুখ ঢেকে।

শ্মশানটা ঘুরে দেখবার তোড়জোর করছে সিদ্ধবাবা আর ব্রহ্মচারী। বাধা দিয়ে বলি, "সূর্য এখন পশ্চিম পাটে। পাণ্ডা-ঠাকুরের বাড়িতে প্রসাদ জুড়িয়ে বরফ হচ্ছে। চলো আস্তানায় ফিরে যাওয়া যাক এবার। খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে তারপর না হয় আসা যাবে আবার।"

পাণ্ডাঠাকুরও আমার পক্ষে হয়ে বলেন, "কোন সকালে আপনারা এসেছেন পেটে একদানা কিছু পড়েনি। এত বেলা অভুক্ত থাকা কি ঠিক!"

পাণ্ডার পিছু পিছু আবার চলি সবাই তাঁর বাড়ির উদ্দেশে। ব্রহ্মচারী পথে দাঁড়ায় তারামন্দিরের দরজায়। পকেট থেকে বের করে নোটবই আর পেনসিল। পাণ্ডা বাধা দেন—বলেন, "এখন খাতা বন্ধ করুন। সোজা আমার বাড়ি গিয়ে প্রসাদ পেয়ে তারপর আপনাদের যা ইচ্ছে করুন এসে। চলুন!"

মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার আচ্ছাদন। চমৎকার শিল্প পরিচয়। ব্রহ্মচারী ও গুলোর লোভে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই কপি করে নিতে চায় কয়েকটা। বলে, "সময় ত আর বেশি নেই। দিনের আলো নিভল বলে। প্রসাদ রাত্তিরে পেলেও চলবে, কিন্তু সূর্যঠাকুর ত আর আমার জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন না!"

বলি, "মোমবাতি জ্বেলে কপি করতে পারবেনা?"

পাণ্ডাঠাকুর এসে ব্রহ্মার হাত থেকে খাতা ছিনিয়ে নিতে চায়!

বলি, "আপত্তি আছে নাকি ঠাকুরমশায় এ গুলো কপি করতে?"

হেসে পাণ্ডা বলে, "হ্যাঁ, এখন করতে আপত্তি আছে। প্রসাদ পেয়ে এসে করুন আপত্তি করবনা কেউ তখন।"

বলি, "কেন পাণ্ডার এত উদ্বেগ আমাদের খাওয়া নিয়ে বলতো সিদ্ধবাবা?"

সিদ্ধবাবা তার ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুলে তর্জনী ঠুকে দেখায়।

ভাবি, সত্যি, টাকার জন্য মানুষ কি না করতে পারে? অন্য পাণ্ডাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে চাণক্যপ্রতিমর বুকে উৎসাহের একেবারে জোয়ার এসেছে দেখছি!

তারপর যতবারই মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসি ততবারই দেখি সেই সুদর্শনপুরুষ দাঁড়িয়ে। তাঁর কি কোনো কাজকর্ম নেই হাতে! চোখেমুখে নিরাশার রঙ মাখিয়ে নিয়ে তিনি কি কেবল ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ান!

সতেরো

ঘরের তালা খুলে দেখি ওদিকের দরজা বন্ধ। এবং সে ভিতর থেকেই। ভাবি কি করে এ সম্ভব হয়? যাবার সময় তো ভুল করে ভিতরের দরজাটা খুলে রেখে গিয়েছিলাম। নিশ্চয় পাণ্ডা-ফ্যামিলির হাতে ডুপ্লিকেট চাবি রয়েছে। জানাবো ব্রহ্মচারীকে? জানাবো সিদ্ধবাবাকে? পরিষ্কার মনে পড়ছে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে আমরাই দরজা বন্ধ করে গেলাম। তাহলে ভিতর দিক থেকে পিছনের দরজা কি করে বন্ধ হল? ভেল্‌কি নাকি?

সঙ্গীদের কিছু বললাম না। আগে দেখে নিই, কিছু খোয়া গিয়েছে কিনা! সব জিনিস ঠিক ঠিক থাকলে মিছেমিছি হৈ চৈ না করাই ভালো।

আমার থলিটাই টেনে আনলাম আগে। খুলে ভিতরের জিনিস দেখে নিলাম সব। হ্যাঁ, ঠিকই আছে। কিন্তু কম্বলের ভাঁজের মধ্যে লুকানো একটা পুরনো খাম আর তাতে ছিল এক টাকার কয়েকটি নোট। মানিব্যাগে টাকা আমি কখনও রাখিনে, ওটা চট করে চোর ছ্যাঁচড়ের চোখে পড়ে তাই। কিন্তু খামেও নজর পড়ল? আর তাহলে রক্ষে নেই। বার বার কম্বল খুলি আর পাট করি। টাকার খামটা কিছুতেই খুঁজে পাইনে। বুঝতে পারলাম খামে তো আমার টাকা ছিলনা, ছিল প্রাণভোমরা। ভোমরা নেইত আমিও যেন নেই। ব্রহ্মতালু ভেদ করে এক ঝলক গরম কি যেন বেরিয়ে গেল। ভয় হল, শুনেছি যোগীদের প্রাণ বেরয় ব্রহ্মতালু ভেদ করে—আমারও কি প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে! একটু অদ্ভুত অস্থিরতা আমাকে আচ্ছন্ন করল কিছুক্ষণের জন্য। যেন

কোন এক অকূল সমুদ্রে পড়ে আমি হাবুডুবু খাচ্ছি। হাতে খড়কুটো একটা কিছু ঠেকছেনা।

পেলাম হঠাৎ রামকৃষ্ণকে। অজান্তে টাকা ছুঁয়েছেন তিনি আর তাঁর হাতের আঙ্গুল বেঁকে যাচ্ছে! তিনি ত মানুষই ছিলেন! আর আমি! আমার এমন হয় কেন আমি কি তাঁর মতো মন পেতে পারিনে ?

বুকটা হঠাৎ কন্ কন্ করে উঠল। বাঁ হাতে চেপে ধরতেই হাতের নিচে একটা কি মচ্ মচ্ করে বাজল। বুক পকেটে হাতটা ঢুকালাম। বেরল সেই খাম। খুলে দেখলাম, হ্যাঁ টাকা কটাও রয়েছে। মনে পড়ল, কম্বলের ভাঁজ থেকে চুরি হতে পারে আশংকা করে আগেই টাকা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু এমন জরুরি ব্যাপারটা এত অল্প সময়ের মধ্যেই ভুলে গিয়েছিলাম আমি ? বয়স এখনও ত্রিশের কোঠার ভিতরে—এর মধ্যেই এমন স্মৃতিবিপর্যয়! এর কারণ ?

কারণ খুঁজতে গিয়ে মনে পড়ে আমার ছোড়্দির বিয়ের কথা। আগের দিন রাত্রিবেলা বিয়ে হয়ে গেছে। বাবা স্বয়ং বরের হাতে মেয়েকে সম্প্রদান করলেন। পরের দিন ভোরবেলা যজ্ঞের ভস্ম দেখে বাবা বলছেন, "আমার উঠনে এ সব ছাই এল কোথা থেকে ?"

মা বললেন, "শোভনার বিয়ের যজ্ঞ হয়েছিল যে কাল রাত্তিরে!"

বাবা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "শোভনার বিয়ে ? কবে বিয়ে হল ?"

মা অবাক হয়ে বললেন, "কেন, তুমিই তো নিজে সম্প্রদান করলে!"

বাবা রেগে গিয়ে বললেন, "মিথ্যে কথা। তোমরা আমাকে না জানিয়ে আমার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছ!"

বড়দাকে মা ডেকে পাঠালেন। বড়দা মায়ের কথায় তৎক্ষণাৎ গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলেন। ডাক্তার এসে ওষুধ

দিলেন। আর বাবাকে একটা আলাদা ঘরে নিজেই শুইয়ে দিয়ে গেলেন।

আমি যদি টাকা খুঁজে না পেতাম তাহলে আমার জন্যও কি ডাক্তার আনতে হতো! কিন্তু এই অজ পাড়াগাঁয়ে ডাক্তার আছে কি?

মোষের শিঙের মোটা চিরুণি আর কাঠের পা ওয়ালা আরশি এসে গেছে। আরশির ফ্রেমে কাঠের উপরে বরফি বরফি কাচ বসানো নানা রঙের। হাতে তুলে নিই। মুখ দেখবার জন্য নয়, চুল ঠিক করে নেবো বলেও নয়—পুরনো দিনের স্পর্শ পাবো বলে। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে এমনি একটি আরশি দেখেছিলাম। আর তাতেই আমি প্রথম নিজের মুখ দেখতে পেয়েছিলাম। তারাপীঠ বেড়াতে এসে পাণ্ডার বাড়িতে আমার নিজের বাড়ির একটি জিনিস স্পর্শ করতে পেয়ে মনটা আনন্দে শান্ত হতে থাকল।

আমার থলি থেকে ছোট্ট আয়না আর প্ল্যাস্টিকের চিরুণি বের করি। ব্রহ্মচারী বলে সিদ্ধবাবাকে, "ছাখো ওর কাণ্ড! এত লটবহর নিয়ে ও আবার নাকি হিমালয়ে পাড়ি দেবে!"

বলি, "তোমরা তো আর আমার বোঝা বইবেনা!"

"বোঝা না বইলে এতটা পথ এলে কি করে?"

"কেন, তোমাদের কাঁধে চড়ে এসেছি নাকি!"

"কাঁধে না চড়লেও হাত রেখেছো মাঝে মাঝে, সে কথা অস্বীকার করতে পারো?"

"সে তো সবাই রাখে। এমন যে মহাপুরুষ গান্ধীজি ভোগ-সুখে আরামে নিস্পৃহ তিনিও দুজন সঙ্গীর কাঁধে ভর করে চলতেন।"

সিদ্ধবাবা এবার মুখ খুলল, "ধৃষ্টতা কম নয় তো! নিজেকে তুলনা করছো মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে!"

পথের দিকের দরজাটা খোলা ছিল। ঘরের ভিতরটা তাই

রাত্রির মতো অন্ধকার। চুপচাপ পড়ে আছি তিনজন, গড়াগড়ি দিচ্ছি খেজুর পাতার মাদুরে। নাকে আসছে কাঁচা গোবর আর মাটির গন্ধ। মাটির ঘরখানা আজই সকালে বুঝি নিকিয়েছে। কানে সুর পেঁৗছল হঠাৎ—

ষষ্ঠীতলায় এলো বান
কুড়িয়ে পেলাম সোনার চাঁদ···

শিশুকণ্ঠের গান। ব্রহ্মচারী চটপট উঠে গিয়ে দরজা খুলল। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে ফিরে এসে বলে, "দেখলাম ছোট্ট মেয়েটা টুক্ করে ঢুকলো গিয়ে উল্টো দিকের বাড়িতে। স্পষ্ট দেখলাম—লালশাড়ি পরনে আর মাথায় তার ঘোমটা। কিন্তু বাড়ির লোক বলে, "আমাদের ঘরে এমন ছোটো মেয়ে কেউ নেই।"

"তাহলে এই মেয়ে কোথা থেকে এসেছিল?"

ব্রহ্মচারীর চক্ষু চড়কগাছ! বলল, "তোমরা শোনোনি সেই গানটা?"

"হ্যাঁ, শুনেছি।"

"নোট করে রাখোতো গানটা!"

"বলি, নোট করতে হবেনা। এ গান আবার কি নোট করব! তাহলে পথেঘাটে যা দেখা যায়, শোনা যায় সব কিছুর নোট করতে হয়!"

বলি, "এ গান মনেই থাকবে!"

"যদিই না থাকে!"

"তাহলে কি ক্ষতি হবে শুনি?"

"তারাপীঠের এক অমূল্য স্মৃতির স্বাক্ষর থাকবেনা কোথাও। এ গান যে তারা মা নিজে গাইলেন!"

সিদ্ধবাবা হেসে উঠল হো হো করে! আমি ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বললাম, "ছি, এ কি করছ তুমি! বাড়ি ভরতি

লোক পাণ্ডাঠাকুরের। ওরা ভাববেন, কোথা থেকে এসেছে একদল ফচকে ছোড়া…।”

“ভাবুকগে, তার জন্য হাসি পেলে হাসবোনা! হাসি কি আমি হাসতে পারি—হাসি নিজে এসে হাসে! বা ব্বা, তারা মা বলে ওকে গান শুনিয়ে গেলেন!” আবার হো হো করে হাসল সিদ্ধবাবা। আর বলল, “তারামায়ের তো আর কোনো কাজ নেই, তোমাকে তিনি গান শোনাতে আসবেন!”

ব্রহ্ম বলে, তাহলে মা কালীরও বুঝি কোনো কাজ ছিলনা, তাই তিনি গান শুনিয়েছিলেন রামপ্রসাদকে!”

বলি, “গান কোথায় শুনিয়েছিলেন। বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন ঘরের!”

“ওই হল। বেড়া বাঁধা আর গান শোনানো একই কথা। আসলে রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলেন সে কথাই বলতে চাই!”

হেসে বলি, “সে কোন শতাব্দী আর এ কোন্ শতাব্দী। মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি এগিয়েছে না পেছিয়েছে হে! এখন কি আর সতীদাহ করে কেউ, না কি গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেয়?”

ব্রহ্মচারীর কি রকম একটু ভাবান্তর হয়। সে আর কথা না বলে চুপ করে থাকে।

আমি বলি, “কি এমন সাধন আছে তোমার যে রামপ্রসাদের সঙ্গে তুমি নিজের তুলনা করছো?”

ব্রহ্ম গম্ভীর মুখে বলে, “যার পাবার সে সাধনা না করলেও পায়। আসল কথা সময়টি হওয়া চাই। ভগবানকে কেউ অল্প বয়সেই পায়, তার আগের জন্মের সাধনা থাকে। আবার কেউ জপতপ করে বুড়ো হয়েও পায়না!”

সিদ্ধবাবা বলে, “তবে তুমি দাবী করছো যে তুমি ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেছো? বেশ তো সে তো ভালোই!

তুমি এখনই এখানে আসন পেতে বসে যাও আর আমরা প্রচার করে দিই যে, আমাদের ব্রহ্মচারী তারামায়ের দর্শন পেয়েছে!"

ব্রহ্ম জোড়হাত করে বলে, "দোহাই তোমাদের। একটু চুপ করো এখন!"

ব্রহ্ম চোখ বুজে বসে রইল। যেন সেই মূর্তিরই ধ্যান করতে থাকল!

আঠারো

"আসুন আপনারা। আসন পাতা হয়ে গিয়েছে।" পাণ্ডাঠাকুরের ডাক এলো।

ভিতর দিকের দরজায় উঁকি দিয়ে তাকিয়ে দেখি—কম্বল বিছিয়েছেন ওঁরা মাটির ওপরে।

বলি, "প্রসাদ পাবো, তাতে আসনের কি দরকার ছিল বলুন।" কাঁচুমাচু মুখে উত্তর দেন পাণ্ডাঠাকুর, "কম্বলই সম্বল গরীবের। একখানি বসবার আসনও নেই। সত্যি কথা বলতে কি আয়ের তো আর পথ কিছু নেই আমার। ছেলেটা ইস্কুলে পড়ে। ওর ইস্কুলের মাইনে, বইপত্তর ঠিকমতো দিতে পারিনে। ছিল এক ঘর মাত্র পাণ্ডা। তা থেকে এখন হয়েছে আঠারো ঘর। স্টেট পড়ে গেছে পাকিস্তানে। রাণীর কাছ থেকে সিধে আর আসেনা ঠিক ঠিক। আর যাত্রীর তো এই আমদানী। আপনারা তিনজনের মুখ দেখলাম কত কাল পরে। তাই তো ঘরে ঘরে আপনাদের নিয়ে টানাটানি!"

সিদ্ধ বাধা দয়ে বলে, "তা আপনার ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান!"

পাণ্ডা হাসলেন। হাসির শব্দ হলোনা, কিন্তু তাঁর দাঁত দেখা গেল। বয়সের রঙে দাঁতগুলো ওদের স্বাভাবিক রঙ হারিয়েছে।

মাটির গেলাসে জল ঢেলে দেয় আর গেলাসে জল থাকেনা এক ফোঁটা।

সিদ্ধিবাবা বলে, "এ কি ঠাকুরমশায়, গেলাসেই যে জল খেয়ে নিচ্ছে, আর আমরা খাবো কি বলুন!" ডেকে

বলে পাণ্ডার ছেলেকে, "ও বাবাঠাকুর, এদিকে এসো তো একবারটি!"

হন্তদন্ত হয়ে পাণ্ডার ছেলেটি এসে হাজির হয়। ঘটি থেকে জল ঢেলে দেয় আবার গেলাসে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জল নেই হয়ে যায়!

পাণ্ডার ছেলে বলে, "আজ্ঞে গেলাসটা ফুটো বটে!"

পাণ্ডা বলেন, "আর তো গেলাস নেই। এই তিনটিই ছিল। যা ঘর থেকে নিয়ে আয় না হয় একটা কাঁসার গেলাসই। জল তো ওদের খেতে হবে!"

সিদ্ধবাবা বাধা দেয়। তবু ছেলে গিয়ে নিয়ে আসে একটা কাঁসার গেলাস।

পাণ্ডাঠাকুর নিজেই পরিবেশন করতে থাকেন। শালপাতা ধুয়ে নিয়েছি আমরা আর তাতেই ভাত পড়ছে। এক একটি ভাত যেন এক একটি বোলতার ডিম। তাতে আবার লালচে লালচে খয়েরি রঙের। সিদ্ধবাবা শুধায়, "এখানেও র‍্যাশনিং আছে নাকি ঠাকুরমশায়!"

"কেন বলুন ত!"

আজ্ঞে, চালের আই মিন ভাতের রঙে যে কলকাতার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে আমাদের!"

"তা কি করি বলুন! আমাদের পাড়াগাঁয়ের চাল এই রঙেরই হয়। আপনারা শহরের মানুষ, কখনও পাড়াগাঁয়ে আসেননি তাই। নিজের খোরাকের চাল আমরা নিজেরাই তৈরি করে নিই কিনা! ওই দেখুননা উঠনে—ও হো এখন তুলে ফেলেছে ঘরে! হয়ত আগে দেখেছেন এখানে ছড়ানো ছিল ধান।"

ডাল দিলেন। জলের ভাগ একটু বেশি। শালপাতার ওপরে ডালের কি রইল আর কি গেল বুঝতে পারলাম না। ভাতগুলো

একটু শপশপে হয়েছে এই যা। নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখি ডালে গন্ধ আছে কিনা।

ঠাকুরমশায় তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে। কে কি রকম করে খাচ্ছি বুঝি তাই লক্ষ্য করছেন। হয়ত বুঝতে পেরেছেন যে আমরা একটু অসুবিধেয় পড়েছি। তাই জন্য একটু বিব্রতও বোধ করছেন নিশ্চয়। তিনি যেন বিনয় করে কিছু বলবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। এই এক্ষুনি হয়ত বলবেন।

এমন সময় ব্রহ্ম বাধা দিল, বলল, "আচমন করেছো?"

ভাতের গ্রাস মুখের কাছ থেকে আবার নামিয়ে আনলাম পাতে।

ঠাকুরমশায় বললেন, "আহা, কেন মুখের গ্রাসটা পাতে রাখলেন। প্রসাদ খেতে আচমনের দরকার হয়না!"

শাক পাতা ডাঁটা কুমড়ো দিয়ে তৈরি পাঁচমিশেলি একটা ঘেঁট এনে পাতে দিলেন ঠাকুরমশায়। লম্বা লম্বা পা ফেলে আবার গিয়ে ঢুকলেন ওঁদের নিজেদের ঘরে। আমি তাকিয়ে রইলাম ও দিকেই!

আবার তক্ষুনি এসে বলছেন, "এ কি, মুখে দিচ্ছেননা যে!"

বলি, "দাঁড়ান, আগে সব মেখে নিই ভাতের সঙ্গে।"

"সব একসঙ্গে মিশিয়ে ফেললে কোনটার কি স্বাদ তা তো বুঝতে পারবেন না!"

হাসি পায় তবু চেপে যাই। মুখে দিই দু'চার গ্রাস তুলে তুলে। না দিয়েত উপায় নেই। পাত সম্মুখে নিয়ে শুধু শুধু বসে থাকাও তো যায়না। আর সেটা ভালোও দেখায়না।

ব্রহ্ম ভক্তিভরে মায়ের নাম নিয়ে বেমালুম ঠাসছে। পাত ওর খালি হয় হয়!

পিসিমাও এসে গেছেন, বলছেন, "হাত নড়েনা কেন বাবা তোমার?"

পাণ্ডাকে উদ্দেশ করে বলেন, "দাদা, মায়ের আসল ভোগের জিনস এদের একটু এনে দাওনা ও ঘর থেকে।"

ঠাকুরমশায় ছুটে যান ঘরে। নিয়ে আসেন কী যেন একটা কালোপাথরের বাটিতে করে। খিচুড়ি? না পায়েস?

তৃষিত চাতকের মত হা করে আছি যেন। খাবার ভালো না হলেও পেটে ক্ষিদে যে রয়েছে সে বিষয়েতো সন্দেহ নেই। মুখে না ফুটলেও মনে তো আছে!

পাতে পড়ল এক হাতা সে বস্তু! পায়েস নয়, খিচুড়ি নয়। সেই শাকা পাতা ডাঁটারই আরেক জাতের পাঁচন। বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে একটু আঁশটে গন্ধ আঁশটে গন্ধ আছে। এ তো আমার চলবেনা। আমি যে নিরামিষাশী! তবু কৌতূহল নিয়ে দুটো আঙ্গুলে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম ও গুলো!

যা ভেবেছি ঠিক তাই। আছেই দু একটা ট্যাংরা মাছের কাঁটা।

একেবারেই হাত তুলে বসে আছি পাত সমুখে নিয়ে।

পাণ্ডা এসে বললেন, "এ কি মুখে দিচ্ছেননা যে!"

সিদ্ধ বলে, "ওর যে আমিষ চলে না মোটেই!"

পাণ্ডা বলেন, "এতো মায়ের প্রসাদ! এ একটু মুখে দিতেই হয়। তা না হলে মা রুষ্ট হবেন!"

আরেক খুঁৎখুঁৎ ঢুকিয়ে দিল মনে আমার। মা আছেন কিনা কিছুই জনিনে। আবার মা যে নেই সেও তো নিশ্চয় করে বলতে পারিনে আমি। এখন উপায়! মহা ভাবনায় পড়া গেল।

শেষ পর্যন্ত দিলাম মুখে তুলে একটু। সেই হাড়িকাঠের গোড়ার মাটি তুলে মুখে দেবার মতো। দিয়ে বিপদ বাড়াল। পেটের ভিতর যা কিছু ছিল সব বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে থাকল।

পাণ্ডা ঠাকুরের চোখ এড়ায়না। আমার দিকে তাকিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে তিনি বলেন, "কাঁটা বিঁধল নাকি?"

বলি, "মশায়, কি আর বলব, মায়ের ভোগে বুঝি আপনারা মাছ দেন ?"

একটু ইতস্ততঃ করে উত্তর দেন পাণ্ডা, "সুদিন ছিল যখন রোজ বলি পড়ত মায়ের সম্মুখে !"

"কি বলি পড়ত—কুমড়ো ?"

"তা কেন হবে! যা বলি দেবার বিধান—পাঁঠাই পড়ত। আপনারা তো সে দেখেননি। এখন দেখাতে পারবও না। পুরানো দিন তো আর ঘুরে আসবেনা আমরা বেঁচে থাকতে। রাজস্টেটেরই বরাদ্দ ছিল সে। তা ছাড়াও লোকের অবস্থা ছিল ভালো। আর সব চাইতে বড় কথা ভক্তি বিশ্বাসের এমন ঘাঁটতি ছিলনা মানুষের মনে। আজকাল তেমন ভক্তি বিশ্বাস দেখা যায়না !

"বলি, পাঁঠা বলি না দিলে বুঝি ভক্তির প্রকাশ হয় না !"

"না। সে কথা বলছিনে। বলছি, দিন কি ছিল আর কি হয়েছে ! সে দিন থাকলে কি আর আপনাকে এমন পাতে হাত তুলে বসে থাকতে হত ! কি করব বলুন, সবই মানুষের অদৃষ্ট।"

বলি, "এ নিয়ে আপনি দুঃখ করবেননা ঠাকুরমশায় ! আসলে আমার তেমন খিদে নেই। তা নাহলে দেখুন না, আমার সঙ্গীর পাতের দিকে চেয়ে ! একটি ভাতের কণা পড়ে আছে কি ?"

উনিশ

পাণ্ডাকে মিথ্যে কথা বলে মনটা খারাপ হয়ে গেল। তিনি না হয় একটা মন বোঝ পেলেন। আমি নিজেকে বোঝাই কি করে। কি দরকার ছিল এ সব ঘোরপ্যাঁচের! সোজাসুজি বলে দিলেই হত যে মশায়, কি করবো, এই ধরনের খাবার খেতে মোটে অভ্যস্ত নই আমি!

কিন্তু তাতে তো তিনি দুঃখ পেতেন। আর মনে মনে চটেও যেতেন আমার ওপর। চটলেই বা কি হত! তবু আমার মনে সান্ত্বনা থাকত যে আমি সত্যকথাই বলেছি! এখন এই যে অপরাধ করলাম—এ তো আমাকে চিরদিন জ্বালিয়ে মারবে! তাহলে কি পাণ্ডাকে আবার বলবো, না মশায়, আপনাকে যা বলেছিলাম সব মিথ্যে! আপনি আবার খাবার নিয়ে আসুন। আমি সব খাবো। নাকে আঙ্গুল টিপে আমি মায়ের প্রসাদ পেটে পুরবো!

না, সেই বা কি করে হয়! নিজের একটা মান সম্মানও তো আছে। ও রকম করলে ভাববে লোকটা নেহাৎ বাজে। একেবারে খেলো। নিজেকে খেলো করতে যাবোই বা কেন? আর এর আগে মিথ্যে কথা একেবারেই বলিনি কখনও! মনে পড়ল, এই যে একদিন দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপিসে ছুটির দরখাস্ত করবো কি বলে? বেড়াতে গিয়েছিলাম বললে তো ছুটি মঞ্জুর হবে না! বলতেই হবে যে অসুখ করেছিল। তা না হলে ছুটি মঞ্জুর হবেনা। মিথ্যে কথা বললে ছুটি পাবো কিন্তু সত্যি কথা বললে ছুটি পাবোনা। তাহলে মিথ্যে বলতে শিখিয়েছে কে?

এই ভাবনাটাকে মন থেকে দূর করে দেবার জন্য নানা যুক্তির অনুসন্ধান করতে থাকি মনে মনে। খুঁজে পাই সেন মশায়কে। নলহাটি ষ্টেশনে সেনমশায় তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত বাড়িয়ে দিলেন, বলেছিলেন, "আপনারা তারাপীঠে যাচ্ছেন যদি তো নিন অল্পমাত্রার এই টাকাটি। মায়ের ভোগের জন্য দিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে আসিবেন।"

আশ্চর্য ভক্তি দেবদ্বিজে এই সেনমশায়ের। আশীর ওপর বয়স হয়েছে, তবু তিরিশ বছরের ফর্সা ব্রাহ্মণ দেখলে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন এখনও। তাঁর এক ছেলে লক্ষ টাকা দিয়ে বাড়ি কিনেছেন আলিপুরে আর এক ছেলে ভারত সরকারের চাকরি নিয়ে বিদেশে আছেন সপরিবারে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ গ্রাম্যপরিবার তাঁর নয়, তবু তিনি কেন ভক্তি করেন তারাপীঠের তারা কে! মনটা আবার মোচড় দিয়ে ওঠে। মায়ের প্রসাদ যেমনই হোক আমার খাওয়া উচিত ছিল।

ভুলেই গিয়েছিলাম, বীরভূমের তীর্থ পরিক্রমার জন্য সেনমশায়ই আমাকে বোধ হয় বলেছিলেন প্রথম। বলেছিলেন, আগে পড়ে নেবেন মহিমারঞ্জন রায়ের বইখানি 'বীরভূম বিবরণ'—তাতে জায়গাগুলোর পরিচয় পেতে আপনার সুবিধে হবে। বীরভূম—বীরভূমিই ছিল একদিন, এ বড় পুরনো জায়গা। এর কোন জায়গায় কি যে লুকনো আছে, শুধু বই পড়েও বুঝতে পারবেন না, আপনাকে পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে!

নিজে তিনি বার বার দেখেছেন এক একটা পীঠস্থান। এখনও দেখতে চান। বয়স হয়েছে। শারীরিক সামর্থ্য নেই তাই পারেননা। তবু সুবিধে করতে পারলেই একবার তাঁর গুরুর আসন দেখতে আসেন নলহাটির কাছে জগধারীর মহানির্বাণমঠ। এখানে তাঁর গুরুভাই স্বামী শ্যামসুন্দরানন্দ রয়েছেন—গুরু

নিত্যগোপালের সেবা পূজা নিয়ে। শুধু গুরুর সেবা নিয়েই ব্যস্ত নন তিনি, তাঁর শিষ্যসেবকদের, দুঃস্থ জনগণের সেবাও করেছেন। পাকিস্তান থেকে নিরাশ্রয় হয়ে এসে কেউ কেউ তাঁর আশ্রয় পেয়েছেন, সে নিজের চোখে দেখে এলাম।

সেনমশায়, শুনেছি ওকালতি করেছেন, মুনসেফি করেছেন, শেষে করেছেন হেডমাষ্টারি। তাঁর পরিবারের অনেক জ্ঞানী গুণীর নাম শোনা যায়। শাস্ত্রে সাহিত্যে, জনসেবায় নানা জন নানা দিকে কাজ করে চলেছেন। তিনি নিজেও অবসর গ্রহণ করে এক মুহূর্ত অবসর থাকেননা। থিয়োসফিক সোসাইটির তিনি একজন সত্যিকারের সদস্য। মানুষ মাত্রেরই প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। কোনো মানুষকেই ঘৃণা করেননা। আবার ঠাকুরপূজাও করেন। সকালবেলা স্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে শুধু কাপড়ের আধখানি গায়ে জড়িয়ে মন্ত্র জপ করতে করতে তিনি ফুল তোলেন, নিজের চোখে দেখেছি। শেষ জীবনের কাজ নিয়েছেন তাঁর গুরুদেব নিত্যগোপালের জীবনকথা দেশবাসীকে জানিয়ে যাওয়ার।

হঠাৎ মনে পড়ল—ফিরে গেলে তিনি ঠিক আশীর্বাদ চাইবেন তারামায়ের। ভাবছি, কথাটা পাড়ব কিনা। নাকি আগে নিরিবিলি সঙ্গীদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করব! ভোজনপর্ব শেষ হয়ে যাক। মনে রাখতে হবে—মায়ের ভোগে সেনমশায়ের টাকায় যেন ওরকম মাছ না পড়ে।

টক নিয়ে এলেন পাণ্ডাঠাকুর। টকে বুঝি টক দিতেই ভুলে গেছেন। শুধু পুরনো কতগুলো কুলের আঁটি পেলাম পাতে। জল তো বেরিয়ে গেছে কখন পাতার ফাঁকে ফাঁকে।

ভালোই হল। পাণ্ডা বেশি চার্জ করতে পারবেনা। এ যা প্রসাদ খাইয়াছে, তার জন্য আবার পয়সা! কিন্তু সিদ্ধবাবার পাতে তো কিছুই অবশেষ নেই। ওর নজিরে পাণ্ডাকে একেবারে

খালি হাতে বিদেয় করা চলবেনা। বাজারটাও তো মাগগীর। পাত পিছু বারো আনার কম ওঁকে দেওয়া চলবেনা। ভালো না হয় তৈরি করেনি, কিন্তু জিনিস তো লেগেছে—চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলাপাতি, জ্বালানি খরচ আর রান্নাবাড়ার পারিশ্রমিক।

তিনতিরিক্কে ন সিকে সোয়া তুটাকা আর ও সবে মোটমাট বারো আনা আরও—এই তিনটি টাকা তো দিতেই হবে। এ তো আর খাবারের দাম বলে দেওয়া চলবেনা! পাণ্ডাঠাকুরকে প্রণামী হিসেবেই। ব্রাহ্মণের ঘরে প্রসাদ খেলে দক্ষিণা দিয়ে তবে বিদেয় নেওয়া বিধি। পাণ্ডাঠাকুর ব্রাহ্মণ কিনা সে খবর নিইনি, নেবার দরকারও বোধ করিনে। তবু পৈতে যখন দেখছি ওঁর গলায়, আর পূজার্চনাও করেন, তখন ধরে নিচ্ছি তিনি তাই। কিন্তু আরও আছে। খাওয়া বাবদ তিন টাকা ওঁকে না হয় দেওয়া গেল। তারপর এই যে সারাদিন আমাদের নিয়ে ঘুরলেন, ছুটোছুটি করলেন আমাদের জন্য, এটা ওটা দেখালেন—ও সবের জন্যও তো কিছু চাই ওঁর!

অন্যমনস্ক ছিলাম। সঙ্গী তুজনে উঠে পড়েছে হাত ঝেড়ে, জল খেয়ে।

বলি, "এ কি, খালি হাতে উঠলে যে! পাতাগুলোও তুলে নিয়ে চলো। মনে রেখো এ গ্রাম দেশ, তা ছাড়া পাণ্ডাঠাকুরের একেবারে খানাবাড়ি। ওঁরা ব্রাহ্মণ হয়ে থাকলে মনে মনে অভিসম্পাত করবেন।"

নিজেদের উচ্ছিষ্ট নিজেরাই পুঁটলি পাকিয়ে নিয়ে উঠে পড়ি আমরা। উঠন পেরিয়ে এগিয়ে চলি ঈশান কোণে ডোবাটার দিকে।

পাণ্ডাঠাকুর ছুটে এসে বলেন, "আহা, আপনারা এঁটো নিতে গেলেন কেন?"

মনে মনে বলি, সে তুমি বুঝবেনা বাবা, বিলটা একটু কমিয়ে রাখলাম। যদি আবার এর জন্য কোনো ঝি চাকরাণীর বকাশশ দাবি করে বসো, তখন।

ডোবার সবুজ জল সামনে নিয়ে বসে গিয়েছি আমরা। হাতের আঁজলায় জল তুলে মুখে দিতে যাবো, এমন সময় পাণ্ডাঠাকুরের আবির্ভাব। হৈ হৈ করে উঠলেন, "করছেন কি আপনারা? এ জল ভালো নয়। মুখ ধোবেন ওই জলে—ওই যে দেখুন আমার ছেলে এনে রেখেছে বালতিতে করে আপনাদের জন্য!"

সত্যিই পাশেই দাঁড়িয়ে বাবাঠাকুর। ঘটি ডুবিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে আমাদের হাতে, আমরা হাত মুখ ধুয়ে নিচ্ছি।

মাত্নরের ওপর এসে পড়তে না পড়তেই চোখ লেগে গেল সঙ্গীদের। এই একটা সুযোগ আমার। থলির ভিতর থেকে খুঁজে বের করি আমার সেই পুরানো খামটা। তাতে যা আছে একে একে গুণে দেখি। আরও তুদিন পথে পথে ঘুরতে হবে।

তারপর বাকিটা ট্রেনে চড়ে তবে গিয়ে পৌঁছতে হবে স্থায়ী আস্তানায়। যা পুঁজি আছে তাতে পাণ্ডাকে দক্ষিণা এক টাকা আর সেন মশায়ের নামে মায়ের ভোগের একটাকা বাদ দিলে ট্রেনে চড়বার পয়সা থাকেনা। তবে সে পথ কি হেঁটে পাড়ি দিতে হবে? গোটা সাতেক স্টেশন—দূরত্ব নেহাৎ কম নয়। ঘণ্টা তুয়েকের জার্নি ত বটেই। তাহলে উপায়!

সিদ্ধবাবার সত্যি সত্যি পিকপকেট যদি হয়েছে তাহলে তো শর্ষেফুল দেখার অবস্থা আমাদের। ব্রহ্মচারীর কাছে যা ছিল তাতে এর আগে তুটো তীর্থ সেরে এলাম। এখন যা সম্বল সব এই খামে। বার বার খুলে খুলে গুণে দেখি টাকা কটা আর ভাবি—সম্মুখে এত পথ পড়ে আছে, পাড়ি দেবো কেমন করে। মনে পড়ে সেই পুরনো গানটা—

হরি দিন তো গেল সন্ধ্যে হল পার করো আমারে

কিন্তু সে গান কি ঠিক আমাদের মতো অবস্থায় পড়েই কেউ লিখেছিল ? সে কথা কে জানে। পয়সাকড়ির অভাব কি তারও ছিল ? গানটা গুনগুনিয়ে গেয়ে চলি। হঠাৎ সুরে সুরে আসে :—

যাদের কড়ি আছে তারা পার হয়ে গেছে

আমি দীন ভিখারী নাই যে কড়ি দেখো ঝুলি ঝেইড়ে।

ঠিক সেই অবস্থায়ই আমরাও পড়েছি। কিন্তু এর জন্য দুশ্চিন্তাটা কি শুধু আমার একলার ? আমার সঙ্গীদেরও নিশ্চয় আছে। ভেবে তাকাই ওদের মুখের দিকে। কিন্তু ওরা যে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে !

ওরা যদি ঘুমোতে পারে, আমি পারিনে !

চোখ বুজি কাৎ হয়ে আমিও। কিন্তু ঘুম আসেনা। ভিতর থেকে একটা ছট্‌ফটানি। কেননা, পয়সা বড় কম আছে সঙ্গে। পথ অনেক বেশি। পথের প্রয়োজন অনেক। কিছু কিছু পেটে না দিলে তো চলবেনা। কয়লা না পেলে এঞ্জিন চলবে কার জোরে !

সময়টা যেন রবারের মতো লম্বা হয়ে চলে। ওরা কতক্ষণ ঘুমিয়েছে ! ওঠেনা কেন ? একেবারে ভাবনা কিছু নেই। সিদ্ধবাবা যাই হোক, ব্রহ্মচারীর তো অনেক কাজ বাকি রয়েছে। মন্দিরের গা থেকে না তার টেরাকোটার ছবি কপি করবার কথা ছিল !

হন্তদন্ত হয়ে ডাকি, "ওঠো ব্রহ্মচারী, ওঠো সিদ্ধবাবা !"

হাত দিয়ে খোঁচা লাগাই দুজনেরই গায়ে। তবু সাড়া নেই। একটু নড়েচড়ে অবিন্যস্ত কাপড়চোপড়ে ওরা পড়েই থাকে।

আমার ভাবনা বেড়ে চলে। একি ! এমন অচেতনের মতো এরা কখনও ঘুমোয়নি তো ! হলো কি ওদের ?

দু'জনেই খাবার পরে মশলা খেয়েছিল—লবঙ্গ আর সুপুরি ! ওরা পান খায়না। আমি পান চেয়েছিলাম আর পেয়েও ছিলাম। বাবাঠাকুরই এনে দিয়েছিল। মুখে দিইনি। আর মুখে দেবও না।

একটা ভয় হল আমার। সিদ্ধ আর ব্রহ্ম কি পাণ্ডার ঘরে মশলা খেয়ে এ রকম অচেতন হল? শুনেছি এ ধরনের কাণ্ড আজকাল হামেশা ঘটে। সারা শরীর শিউরে উঠল। এত খাতির, এত যত্ন, কথার আগে হাজির থাকা—না জানি পাণ্ডাফ্যামিলির মনে কি আছে!

আমার পানের খিলিটা খুলে দেখি। নাকের ডগায় লাগিয়ে গন্ধ টেনে নিই। একটু স্থির হয়ে থাকি কিছুক্ষণ চুপচাপ। না, খয়ের ছাড়া আর কিছু নেই। চুন ত থাকেই। আগেই বলে দিয়েছিলাম, পানে যেন দোক্তাটোক্তা কিছু দেবেন না।

পানটা মুখে পুরে দিই। ওদের যা হয়েছে, আমারও হোক।

চিবিয়ে চিবিয়ে তাড়াতাড়ি গিলে ফেলতে চাই। কিন্তু গলায় লাগে সুপুরি বুঝি। কানের ফুটো দিয়ে গরম ভাপ বেরয়। দুচোখে হঠাৎ অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ঘুরতে থাকে আমার চারদিকে। এখন উপায়? এ আমার হল কি?

ডাকি, "ব্রহ্মচারী, সিদ্ধবাবা, ওঠো, শিগগির ওঠো, দেখো আমার কি হল!"

কোনো সাড়া নেই!

মায়ের মুখ মনে পড়ে যায়। একা বসে আমার কথা ভাবছেন। এই দূরদেশে যদি আমার কিছু ভালোমন্দ হয় তাহলে? মাকে দেখবে কে? ভীষণ একটা অস্থিরতা পেয়ে বসে আমাকে। তবু বাঁচতে আমাকে হবেই, ফিরে যেতে হবে মায়ের কাছে। তা না হলে মা যে আমার শোকে মরে যাবেন।

এক ঘটি জল পেলাম হাতের কাছেই। তা থেকে হাতের আঁজলায় নিয়ে জল ছিটিয়ে দিতে থাকলাম নাকেমুখে। ছেলেবেলায় একবার পান খেয়ে এ রকম হয়েছিল, তখন মা এ রকম করেছিলেন।

জলের ঝাপ্টা চোখেমুখে দিয়ে নিয়ে আমি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি।

চেঁচামেচি করতে করতে ওরা দুইজনেই উঠে বসে। সিদ্ধবাবা বলতে থাকে, "ও ব্যাটার কি রকম মাথা খারাপ! জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে আমার সারাটা শরীর ভিজিয়ে দিয়েছে ছাখো!"

ব্রহ্মচারীও একই কথার পুনরাবৃত্তি করে।

আমি তখন চেঁচিয়ে বলি, "ভাই, এই তোদের ছুঁয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি জীবনে আর কখনও পান মুখে দেবোনা!"

পরক্ষণেই ভাবি, প্রতিজ্ঞাটা একটু কড়া হয়ে গেল না। পানের রস শিরঃপীড়া নাশক, আমার আবার ওই ব্যাধি আছে যে! পানের রস দিয়ে যদি কখনও মহালক্ষ্মীবিলাস বড়ি খেতে হয়। তাই আবার শুধরে নিয়ে বলি, "অবশ্য সুপুরি যে পানে দেওয়া থাকবে সে পানই শুধু খাবোনা আমি।"

কোনোই মন্তব্য নেই ওদের মুখে। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে ব্রহ্মচারী গম্ভীর গলায় উচ্চারণ করল, "একেবারেই ছেলেমানুষ। মোটে কাণ্ডজ্ঞান নেই!"

একটু হেসেই আমি বলি, "যে কাণ্ডই করে থাকি, তোমাদের যে জ্ঞান ফিরেছে এতেই আমি খুশি। এখন আমাকে বকো আর ঝকো আমি পিঠে বাঁধবো কুলো, মারো আর ধরো আমি কানে গুঁজবো তুলো!"

সিদ্ধবাবা হেসে উঠলো। বলল, "বললে একটা কথা সেও উল্টোপাল্টা হয়ে গেল।"

মন্দিরচত্বরে জুতো নিয়ে ঢোকা নিষেধ। এদিকের দরজা দিয়ে ঢুকে নিচে থেকে উঁচুতে পা বাড়াবে এমন সময় বুঝি মনে পড়ে কথাটা। আমার এতে মজা। আমি যে খালি পায়ে চলি। ঝ্যাংটোর নেই বাটপারের ভয়। জুতো পরিনে, কাজেই ভাবাভাবিরও বালাই নেই, কখন পরতে হবে, কখন খুলতে হবে! সঙ্গীরা ভেবে ভেবে অস্থির ওদের জুতো নিয়ে। বলে, "এখানটাতে রেখে গেলে কি কেউ নিয়ে পালাবে!"

বলি,, "মানুষে না নিলেও কুকুরে কি করবে কে জানে। চামড়ার গন্ধ পেলে কুকুরের জিভে যে জল গড়ায় জানো না!"

সিদ্ধবাবা তক্ষুনি ছুটে যায় পাণ্ডার বাড়িতে। ওখানে জুতো খুলে রেখে তবে আবার ফিরে আসে মন্দিরে।

ইচ্ছে ছিলনা, তবু খাতা পেনসিল নিয়ে বসে যাই ব্রহ্মচারীর পাশাপাশি আমিও মন্দিরের বারান্দায়। ব্রহ্মচারী যেমন খুশি টানে পেনসিল খাতার পাতায়, মন্দিরের গায়ের ছবি যেন ফুলের মতো ঝরে পড়ে ওর চোখের সম্মুখে। আর আমি একটা টান দিই তো তিনবার মুছি রবার দিয়ে। মানে গাছের ডাল ভাঙি তবু ফুল হাতে আসে না। ব্রহ্ম দেখে দেখে হাসে আর বলে আমাকে, "ছবি তুমি পারবেনা, সময় কম। কাজ বেশি। তবে শুধু ডিজাইনগুলো ধরে নিতে পারো সংক্ষেপে, সংকেতে।"

কত কালের পুরনো এ সব টেরাকোটা। তবু মনে হয় এ থেকে ডিজাইন কপি করে নিয়ে যদি তোলা যায় রঙিন সুতোয় টেবিল-ঢাকনিতে, রুমালে, ব্লাউজের হাতায়, গলায়, কেউ ধরতে পারবেনা

এ গুলো এতকালের পুরনো। এই দেশেরই শিল্পীরা কত দূর ভাবীকালের প্রয়োজন মিটিয়ে রেখে গেছেন কত ছলে, কত যত্নে—ভাবলে অবাক হতে হয়।

মন্দিরের পিছনেই পাণ্ডাদের ঘরবাড়ি। ওখান থেকে সুড় সুড় করে দলে দলে ছেলেমেয়েরা এসে দাঁড়ায় ব্রহ্মচারীকে ঘিরে। ওপরে একটান, নিচে এক টান, আশে পাশে আর দু চারটে টানটোন দিলেই দিব্যি একটা ছবি দাঁড়িয়ে যায়। ওরা সব অবাক হয়ে দেখে ব্রহ্মচারীর হাতের খেলা।

যশোদা গোপাল সীতা হনুমান, হরপার্বতী, লক্ষ্মীসরস্বতী, এমনি দেয় দেবতার প্রতিকৃতি—ফুলের মতো ফুটে আছে মন্দিরের গায়ে। কিন্তু যথার্থ পূজারীর হাতে ছাড়া সে সব ফুল উঠে আসেনা যার তার সাজিতে। ব্রহ্ম ওগুলো থেকে বাছাই করে কয়েকটি পেড়ে নেয় ওর স্কেচের সাজিতে।

প্রতিদিনের সংসারের ছবিও আছে। দুই পালোয়ান কুস্তি লড়ছে। গড়গড়া টানছেন বুড়োদাদু, এমনি কত কি! মন্দিরের সম্মুখে হাড়িকাঠে পাঁঠাবলি হচ্ছে—সেও রয়েছে।

পাঁঠার পিছনের ঠ্যাং দুটো টেনে ধরেছে একটা লোক। ছবিটা দেখতে দেখতে কোথায় চলে যাই যেন আমি, কোন দেবীমণ্ডপের সম্মুখে—শুনতে পাই বিপদাপন্ন পাঁঠার পরিত্রাহি চীৎকার—ম্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ— .....

নেশা কেটে যেতেই চমকে উঠে আবার ভাবি, ছবিতেও প্রাণের স্পর্শ থেকে যায় এ কথা তাহলে মিথ্যে নয়!

বীরভূমের আরও অনেক মন্দির দেখেছি। টেরাকোটার শিল্পকর্ম দেখে দেখে অভিভূত হয়েছি। কিন্তু এই পাঁঠাবলির ছাব যে রকম মনকে স্পর্শ করতে পেরেছে, তেমনটি আর কিছুতেই পারেনি!

খটাং শব্দে হঠাৎ দরজা খুলে যায় মন্দিরের। লালপাড় শাড়ি

দিয়ে ঢাকা একটা পাহাড় যেন সম্মুখে। পাহাড়ের ওপরে একখানি দেবী-আনন। আগেও একবার প্রণাম করে গেলাম এঁকেই। কিন্তু তখন তো অতো কাছে এসে দেখিনি। মুখখানি মাটির নয়, পাথরের নয়, পিতলের।

ব্রহ্মচারী এগিয়ে গিয়ে দেখে। বুঝি মাকেও খাতায় তুলে নেবার ইচ্ছে জাগে ওর মনে।

কে একজন ঢোকে এসে মন্দিরের ভিতরে ওপাশের দরজা দিয়ে। ঠেলে দেয় এক বিরাট তামার থালা। থালাটা সম্মুখে এদিকে দরজার চৌকাঠ অবধি এসে থামে। ব্রহ্মচারীর আবার সেই থালায় কি ছুড়ে দেয়। ঝন্···শব্দ হয়। সতৃষ্ণ দৃষ্টি আছে ভিতরের লোকটির। আরও এমনি ঝন্···শব্দের অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে।

আমিও পকেটে হাত ঢোকাই! আঙ্গুলে ফীল করে দেখি আছে চারকোণা মুদ্রা একটি। কিন্তু এই থালায় তার সবটা দেওয়া যায়না!

সেই সুদর্শনপুরুষের দর্শন পাই আবার। মুখে তাঁর কথা নেই। বুকের ভিতর তবু যেন ডানা ঝাপটায়। কি যেন বলবেন বলে কতবার আসেন আমাদের কাছাকাছি কিন্তু সাহস হয়না বলতে। নিরাশার দৃষ্টি হাওয়ায় ছড়িয়ে রেখে তিনি আবার ফিরে যান কোথায় যেন।

দিয়ে দেবো নাকি আমার পকেটের চারকোণা মুদ্রাটা ওর হাতে!

কিন্তু এতে কি ওর দুঃখ ঘুচবে?

না, সে হয়না। পথে চলতে চলতে যখন পেট চোঁ চোঁ করবে আমাদের তখন তো আর এই মুখের কথা মনে করলে চলবেনা। এই মুদ্রাটি তখন প্রকৃত বন্ধুর কাজ করবে।

ব্রহ্মচারীকে তাড়া দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে চলি। উঁচু চাতাল থেকে নামতেই খটাং শব্দে বন্ধ হয়ে যায় মন্দিরের দরজা। ব্রহ্মচারীকে শুধাই, "প্রণামী কত দিলে?"

"তা বলবো কেন ?"

"তুমি না বলেছিলে পকেটে তোমার ছুঁচোয় ডন মারছে !"

"তা, এখনও তো মারে, ছ্যাখোনা তুমি হাত দিয়েই !"

দিলাম হাত ঢুকিয়ে ! আছে গোটা চারেক ছ্যাঁদা পয়সা ।

মন্দিরের সম্মুখে চারদিক খোলা এক মণ্ডপ । এখানে ওখানে আবর্জনা স্তূপাকার । মণ্ডপের পরেই একটি ছোট্ট চালাঘর । ওই ঘরের দরজায় বৈঠক বসেছে চারজনের । চতুর্মুখ ব্রহ্মা যেন চতুর্দেহ হয়েছেন । ওঁদেরই একজনের দিকে অঙ্গুলিসংকেত করে সিদ্ধবাবা বলে, "এই নাকি সেই বশিষ্ঠ মুনি ?"

মুনিঋষিদের চেহারা আমরা যে রকম কল্পনা করি—ঠিক তেমনি দেখতে এক বুড়ো । চুল শাদা, চোখের ভুরু অবধি শাদা, গায়ের লোমও তেমনি ।

দেখে ব্রহ্মচারী বলে, "যাবে নাকি একবার বশিষ্ঠের কাছে ?"

সিদ্ধবাবা বলে, "তোমার যেতে হবেনা । বশিষ্ট স্বয়ংই আসবেন তোমার কাছে যথাসময়ে !"

"তোমার কাছে বলেছেন নাকি ?"

"বলুন আর নাই বলুন—যখন আসবে তখন বলো যে হ্যাঁ, সিদ্ধ সত্যি বলে ।"

বেলা যায় । সময় নেই । এখনও অনেক কিছুই দেখা বাকি । তা ছাড়া রাত্রিবেলার খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে সেই দোকনটাতে । পাণ্ডার বাড়িতে প্রসাদ আর পাবোনা—আগে থেকেই নোটিশ দিয়ে রেখেছি । দোকানেও নাকি খাবার জুটবেনা আগে থেকে বলে না রাখলে । কিছু অ্যাড্ভান্সও করতে হবে ওদের ।

মন্দির-চত্বর থেকে নেমেই তো দোকান । হ্যাঁ, খোলাই আছে দরজা । জানা গেল চিঁড়ে মুড়ি নেই । আটার লুচি ভেজে দিতে পারবে—ছুটাকা সের লাগবে । ময়দা নেই । পাওয়াও যায়না ।

ঘি নেই। দালদাও নেই। তাহলে? বাদাম তেলে ভাজবে লুচি? খাঁটি সরষের তেল রয়েছে, কিন্তু দাম একটু বেশি লাগবে।

কিন্তু শুধু লুচিতেই তো আমাদের হবে না! বুঁদেও চাই। সাড়ে তিনটাকা সের। গরজ বড় বালাই। যা বলে এখন তাই সই। হিসেব কিতাব করে নিয়ে সবসুদ্ধ দু' টাকার জিনিসের অর্ডার দিয়ে আমরা চললাম আবার। বলে রাখলাম সন্ধ্যের পরই চাই। বেশি রাত করলে চলবেনা, আমরা জিনিস নেবোনা। কিন্তু না নিয়ে উপায় আছে! একটাকা আগেই দিয়ে দিয়েছি যে!

দোকানী বলে, "তারও আগে যদি চান তো আমাদের সুবিধে। কেরোসিন নেই, অনেক রাত অবধি আলো জ্বেলে রাখা হয়না।"

এগিয়ে চলি আবার। দোকান ছাড়িয়েই বাঁ দিকে একটা সাইনবোর্ড—'শান্তি আশ্রম'। কিসের না কিসের আশ্রম? লোকজন কেউ নেই। আমরা চোখ বুলিয়ে চলে যাই।

পথে চলছে আরও দু'তিনজন। তাদের মধ্যে তর্ক বেধেছে—'শান্তি আশ্রম' আগের না 'শান্তিনিকেতন' আগের। অধিকাংশের মত—'শান্তিনিকেতনই' আগের। শান্তি আশ্রম নাম তাহলে বেআইনি। রবি ঠাকুর মোকদ্দমা করলে 'শান্তি আশ্রম' উঠে যায়।

আমরা চুপচাপ পাশ কাটিয়ে চলে যাই। হঠাৎ একজন জিজ্ঞেস করে, "আপনারাই বোলপুরের যাত্রী? আচ্ছা, সেই বোলপুরেই তো রবিঠাকুরের শান্তিনিকেতন?"

সিদ্ধবাবার দিকে তাকাই। সে জবাব দেয়, "ঠিক বোলপুরে নয়, ওখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে।"

"কি করে সেখানে যাওয়া যায়?"

"হেঁটে, গরুর গাড়ি করে, ট্যাক্সি-বাস-রিকশা-সাইকেল।"

"ওখানে কি কি দেখবার আছে?"

"গাছপালা, বাড়িঘর, ইস্কুল কলেজের ছাত্র আর ছাত্রী আর অধ্যাপক অধ্যাপিকা।"

"কি এক মন্দির আছে না?"

"আছে।"

"কি ঠাকুর আছে ওতে?"

"কোনো ঠাকুর নেই ওতে। মানুষেরা সপ্তাহে একদিন জমায়েত হয়ে কেউ গান করে কেউবা শোনে।"

"গীর্জা নাকি।"

"না, মন্দির।"

"হিন্দুর? না খ্রীষ্টিয়ানের?"

"মানুষের।"

"মুসলমান নেই ওখানে?"

"কারও থাকতে বাধা নেই সেখানে।"

একটা হৈ চৈ কানে আসে দোকানটার ওদিক থেকে। ঝগড়াঝাটি বেধেছে নাকি? প্রশ্নকর্তারা ওদিকে ছুটে যায়। আমরা পা চালিয়ে দিই শ্মশানের দিকে। রক্ষে পাওয়া গেল বাবা!

সূর্যদেব এখন নিষ্প্রভ। পাণ্ডা বলেছিলেন যে এমনি সময়ে জঙ্গলের টঙ্গী থেকে সেই যোগী বেরিয়ে আসেন কুণ্ডে স্নান করতে। এবার তাঁকে দেখতে হবে। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে।

দু পাশে দুটি বাঁধানো বসবার জায়গা। মাঝখান দিয়ে শ্মশানে ঢোকবার পথ। আমি এ পাশে বসি। ও পাশে ওরা দু জন।

তিনজনেই তাকিয়ে থাকি জঙ্গলের দিকে। যোগীর টঙ্গীর দরজার দিকে আমাদের দৃষ্টি। দরজা এখনও বন্ধ।

চাণক্যর কথা তো! সিদ্ধবাবা বলে, "আসলে কেউ ঐ আবর্জনার ভিতর বসে আছে কিনা সন্দেহ!"

ব্রহ্মচারী বলে, "চুপ করে থাকো ত কিছুক্ষণ। দেখাই যাক না! মানুষকে অত অবিশ্বাস করা ভাল নয়। যোগীপুরুষের দর্শন অবশ্য ভাগ্যে না থাকলে পাওয়া যায়না!"

একুশ

কখন দরজা খুলে গেল আমরা বুঝতেই পারিনি। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে তিনি আসছেন। ইনি ছাড়া আর কে হবেন—কালো কুচকুচে চুলের বোঝা মাথায়, কালো দাড়িগোঁফে মুখ ঢাকা। প্রায় বোজা চোখ—দৃষ্টি নাকের ডগায়—তিনি এগিয়ে আসছেন ধীরে ধীরে। পরনে শাদা কাপড় একটুক্‌রো, একখানি তাঁতের গামছায় শরীর ঢাকা। তাঁকে দেখছি তিনি আসছেন। হাতে একটি খালি বালতি, পায়ের নালায় কিসের প্রলেপ লাগানো। তিনি আমাদের মাঝে এসে পৌঁছলেন।

ব্রহ্মচারী উঠে দাঁড়ালো। হাতজোড় করে নমস্কার জানালো। প্রতিনমস্কার করলেন যোগী। ঠোঁটে তাঁর প্রশান্তির হাসি একটু দেখা দিল।

আমিও হাতজোড় করে মাথা নিচু করলাম তাঁর উদ্দেশে। যোগী তাকালেন আমার দিকে। আবার তাঁর ঠোঁট দুখানি একটু প্রসারিত হল। একটু শান্তি, একটু হাসি, মন প্রাণ ছুঁয়ে গেল তাতে। তাকিয়ে রইলাম সুন্দর মুখের দিকে। কোনো ভয় কোনো সংকোচের লেশমাত্র নেই মনে আমার। যেন একটি ছোট্ট শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। শুধালেন ধীরে ধীরে—শোনা যায় কি না যায়, "আপনাদের নিবাস?"

দেখলাম তাঁর সুন্দর ছোটো ছোটো দাঁত—যেন মুক্তো ঝক ঝক করছে দু পাটি।

তাঁর কথার উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল। তাই তিনিই আবার বলেন, "জগদীশবাবা পাঠিয়েছেন বুঝি?"

আমি তাকাই ব্রহ্মচারীর মুখের দিকে। ব্রহ্ম তাকায় সিদ্ধবাবার মুখের দিকে। কেউই চিনিনে জগদীশবাবাকে। শুনিনি তাঁর নাম। কোথায় থাকেন তিনি ?

আবার হাসলেন। শান্ত মধুর হাসি। নীরব দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন তিনি কুণ্ডের দিকে।

যোগীর মুখে দুটি কথা শুনে শোনবার আগ্রহ আমাদের বেড়ে উঠল শতগুণ। ব্রহ্মচারী বলল, "চুপচাপ বসোনা। স্নান সেরে ফিরে আসুন তিনি। তখন আবার তাঁকে ধরবো।"

যোগীকে কি কথা জিজ্ঞেস করা হবে, কেমন ভাবে, কেমন ভাষায় জিজ্ঞেস করবো, এ সব জল্পনা কল্পনা করছি আমরা—এর মধ্যেই দেখি তিনি ফিরে এসেছেন এক বালতি জল হাতে নিয়ে।

আমাদের মাঝখানে পৌঁছতেই আবার দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালাম। সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্ম আর সিদ্ধও। তারপর বলি তাঁকে, "আপনার মুখ থেকে কিছু শোনবার আশা করছিলাম আমরা। কখন সময় হবে একটু যদি বলেন।"

সেই শান্ত হাসি ঠোঁটে মাখিয়ে বলেন, "সময়, সময় কি আমার হবে কখনও। আগামীকাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেন—আপনারা তো রয়েছেন আজকের রাত্রিটা !"

বলি, "আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল ভোরবেলা উঠেই রওনা দেবার মনস্থ।"

"তা বেশ। রওনা হয়ে পথে আমাকে দর্শন দিয়ে গেলেই পারেন।"

তারপর তিনি ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুকলেন তাঁর ঘরে। আমার মনে হল পূর্ণচন্দ্র যেন হঠাৎ কালো মেঘের আড়াল হয়ে গেলেন। তাঁর সুধার স্পর্শ লেগে রইল আমাদের দেহে মনে।

ব্রহ্মচারীর মুখটা কালো হয়ে আছে। শুধাই, "কি হল তোমার হে। এমন কেন ?"

বলে, "আমার মনে একটা খুঁৎখুঁৎ ঢুকেছে। এমন ভাবে পথে দাঁড় করিয়ে যোগীকে দিয়ে কথা বলিয়ে নেওয়াটা ঠিক হয়নি।"

বলি, "তিনি তো কিছু রাগ করেননি। অখুশি হলে নিশ্চয় ওঁর ভাবে তা বোঝা যেতো। তাহলে কি তিনি এমন সহজভাবে কথা বলতেন।"

বলে, "যোগীরা কখনও অখুশি হন না। ওঁরা সবাইকেই সমান দেখেন। সবার প্রতি ওঁদের কর্তব্য রয়েছে সেটা ওঁরা ভাবেন শুধু। কিন্তু আমাদেরও তো ওঁদের প্রতি কর্তব্য আছে?"

যোগীর টঙ্গীর কাছে দাঁড়িয়ে ব্রহ্ম বলে, "আপনাকে আমরা পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে কি আপনার সময় নষ্ট করেছি?"

ছায়ামূর্তির মতোই তিনি বেরিয়ে এলেন। কিন্তু সামনে দাঁড়ালেন যেন উজ্জ্বল দিনের আলোয়। আমাদের কথায় তিনি যেন লজ্জাই পেলেন। বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, "আপনারা ভক্ত, আমি কীটানুকীট!

সেই অমিয়মাখা হাসিটুকু তাঁর তুখানি অপূর্বসুন্দর ঠোঁটে মাখিয়ে তিনি ঢুকে পড়লেন তাঁর সাধনকুটীরে। কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন—শ্মশানের এই জঙ্গলের অসংখ্য গাছ পালা লতাপাতায় তিনি যেন এক হয়ে গেলেন। আমাদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে তিনি হলেন নীরব রাত্রি আর নিবিড় জঙ্গলের একান্ত আপনার!

বিনয়নম্র মুখখানি চোখের ওপর ভাসতে থাকে কিছুক্ষণ। কথা বেশি শুনলেই কি শান্তি পাওয়া যায়! ঐ যে তুটো একটা কথা শুনলাম কি শুনলামনা—কানে লেগে রইল তাই।

অন্তরে তন্ত্রের সাধনা, বাইরে বৈষ্ণবের 'তৃণাদপি সুনীচেন' বিনয়। তুই ধারার যোগফল এই যোগীতে দেখতে পেলাম।

সন্ধ্যার পর অন্ধকার। তারপর রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় আবরণে নীরন্ধ্র এই তারাপীঠের শ্মশান। আকাশ দেখা যায় না। তারার মতো জ্বলে নেভে অসংখ্য জোনাকি। ব্রহ্মচারীর ধ্যান গভীর হয়। সিদ্ধবাবার কণ্ঠে ওঠে ভয় তাড়ানো গান ঃ

কালো মায়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন...

ভয়ের তীব্রতা গানের সুরে কিছুটা হ্রাস হয়। আমি ওর সুরে সুর মিলিয়ে দিই। গলা কেঁপে কেঁপে ওঠে। তবু চুপচাপ বসে থাকা যায়না। শুধু শুধু গা ছম্‌ছম্‌ করে থেকে থেকে।

বাইশ

পায়ের শব্দ আসে কানে। সুর বন্ধ হয়ে যায়। কারা যেন আসছে। কান পেতে থাকি। হ্যাঁ, আসছে এ দিকেই। স্পষ্ট বোঝা যায়না। তবু মনে হয় তিনটি মনুষ্যমূর্তি।

আমাদের পাশ দিয়েই পথ। কত লোক চলে কত কাজে। হয়ত তেমনি কারা আসছে একদিক থেকে, চলে যাবে অন্যদিকে!

কিন্তু আসছে যে আমাদেরই দিকে। একেবারে কাছে এসে গেছে। ত্নটো বাঁধান জায়গার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। তু জন বসলো আমার পাশে। একজন ও পাশে ওদের কাছে। বসেই একচোট হেসে নিল তিনজনে!

অচেনা লোক। অচেনা লোকের পাশে বসেছে। এত হাসির কারণ কি? সিদ্ধবাবার গান শুনে? হয়ত সুরে হয়নি তাই ঠাট্টা?

কিছুক্ষণ থেমে থাকে। তারপর আবার হাসতে আরম্ভ করে। আমাকে তু দিক থেকে চাপ দেয়। আমি উঠে পড়তে চাই। কিন্তু উঠতেও পারিনে।

ডেকে বলতে চাই ব্রহ্মচারীকে, সিদ্ধবাবাকে। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরয়না। বুঝতে পারিনে আমি জেগে অথবা ঘুমিয়ে। সত্যি দেখছি না স্বপ্ন দেখছি।

হাসি থেমে যায়! প্রশ্ন ওঠে ওদের গলায়, "তোমরা কারা? কোথা থেকে এসেছো? এই শ্মশানে কেন? ভাগো বলছি!" এবার বুঝি আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে যায়। তার আগে উঠে ছুটলে হয়। কিন্তু ওরা তুজন যে মোটে নড়ছে না। নড়লেও

বুঝবো কেমন করে। ওরাতো আমার পাশে বসে নেই! তা ছাড়া আমার চোখ যে বোজা। খুলতে পারিনে ভয়ে—কি না কি দেখবো বীভৎস!

উগ্র গন্ধ লাগে এসে নাকে। বোতলের ছিপি খোলার শব্দ পাই যেন। আবার সেই বিকট হাসিটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় জঙ্গলের দিকে।

ভূতে পেলে নাকি রাম নামও মুখে আসেনা। রামনাম মুখে এলে তো ভূতই আসতে পায়না। আমার বুকে ভয়ের নাচন এখনও থামেনি। তবু চোখ মেলে তাকাই। সত্যি? মূর্তিরা সরে গিয়েছে তাহলে?

ভয় কেটে গিয়ে আমার রাগ বেড়ে ওঠে। সিদ্ধবাবা আর ব্রহ্মচারী এই অদ্‌ভূতদের আবির্ভাবে এ রকম মৌন অবলম্বন করেছিল কেন? ওরা যেই এল অমনি চটপট কেটে পড়া উচিত ছিলনা কি আমাদের! মানুষ যখন নেশার বশীভূত হয় তখন সে যা খুশি তাই করতে পারে। ঐ তিনটে মাতাল ইচ্ছে করে যদি তাহলে আমাদের তিনজনেরই গলা টিপে দিতে পারেনা কি!

ওরা দুজনে এখনও কথা কিছু বলছেনা। ব্যাপারটা কি? মহাশ্মশানের মাহাত্ম্যে সমাধিলাভ করেছে নাকি! নাকি আমার ছটফটানি উপভোগ করছে?

একটা আলো আসছে। আলোর সঙ্গে সঙ্গে দুটো কালো পা মাটিতে দুলে দুলে কেঁপে কেঁপে এগিয়ে আসছে। কাছাকাছি হতেই বোঝা যায়—লণ্ঠন হাতে মানুষ একজন।

লণ্ঠনটা আমাদের মুখের সোজাসুজি তুলে ধরে বলে, "সাহস তো কম নয়? আপনারা তান্ত্রিক না কাপালিক? এই চতুর্দশীর রাত্রিতে মহাশ্মশানে এসে বসেছেন।"

সিদ্ধবাবার মুখ ফোটে, "কেন তাতে কি আছে?"

পাণ্ডা বলে, "আর কথা বলবেননা। উঠে চলুন শিগগির। পরে

সব শুনতে পাবেন। দোকানের দরজা বন্ধ হয়ে গেলে আপনাদের খাওয়াদাওয়া বন্ধ থাকবে রাত্তিরের মতন, সে কথা মনে নেই বুঝি।"

"খাওয়াদাওয়ার কথা পরে। আগে বলুন এখানে মাতালের আড্ডা ফাড্ডা আছে নাকি কোথাও?"

পাণ্ডা অবাক হয়ে শুধায়, "কেন এমন কথা বলছেন বলুন ত!"

"আমরা এসে বসতে না বসতেই তিনটে মাতাল এসে হাজির। কি বিকট হাসি হাসতে লাগলো অসভ্যের মতো!"

ব্রহ্মচারী আমার মুখে ওর হাত চাপা দিয়ে রাখে।

পাণ্ডা উৎসুক হয়ে উৎকণ্ঠা নিয়ে শুধায়, "কি বলছিলেন সব? তিন তিনটে মাতাল? এখানে? এই শ্মশানে?"

ব্রহ্মচারী বলে, "না ঠাকুরমশায়, ও সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাই বুঝি ও রকম কিছু একটা স্বপ্ন দেখেছে।"

আমি রেগে গিয়ে বলি, "এমন জ্বলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটা বললে তুমি, বামাক্ষ্যাপার সিদ্ধপীঠে বসে? তোমরা দেখতে পাওনি? বলো দিকি সত্যি করে? মা তারার দিব্যি দিয়ে বলো দিকি?"

সিদ্ধবাবা বলে, "অত গলা ছেড়ে কথা বলোনা এখন। বাবারা শুনতে পেয়ে আবার এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে জঙ্গল থেকে।"

পাণ্ডা বলেন, "খুব আমাদের ভাগ্যি যে আপনারা বেঁচে গেছেন। নেহাৎ মায়ের শুভদৃষ্টি আছে আপনাদের ওপর তাই।"

পথ চলতে চলতে শুধাই আবার, "লোকগুলো ডাকাত ঠ্যাঙারে নয় তো?"

"না। ডাকাত নয়। ঠ্যাঙারে নয়। মাতালও নয়।"

"কি বলছেন? তবে? এখানকার স্থানীয় ভদ্রঘরের কেউ?"

"না।"

"তা হলে?"

"সে কথা এখন বলবো না। রাত পোহালে শুনতে পাবেন।"

ভয় প্রায় চলে গিয়েছিল এতক্ষণের নানা কথাবার্তার হট্টগোলে মন থেকে। আবার ভয় ফিরে এল। তাই কৌতূহল হয়ে উঠল দুর্দমনীয়! বার বার পাণ্ডাকে শুধিয়ে চললাম, "বলতে আপনার আপত্তি কিসের ঠাকুরমশায় ?"

"সেও বলব না এখন।"

"কেন ?"

"এখন সে সব বলি যদি তাহলে আপনারা ঘুমোতেই পারবেন না রাত্তিরে !"

সিদ্ধবাবা আর ব্রহ্মচারী চমকে উঠে বলে, "তাই নাকি ? তাহলে এ তো বড় সুবিধে জায়গা নয় মশায়! এ কি স্বাধীন ভারতের মধ্যে নয় ? এখানে কি পর্তুগীজদের শাসন চলছে !"

পাণ্ডা বলেন, "অত শত খবর রাখিনে মশায় !"

তেইশ

চলতে চলতে হঠাৎ রাইট অ্যাবাউট টার্ন করে পাণ্ডাঠাকুর বলেন, "এই যে দোকানে এসে গেছি। আমি তাহলে চলি বাড়িতে। আপনারা খাওয়াদাওয়া করুন। কিন্তু একটা কথা—খবরদার, শ্মশানে যা দেখেছেন তা নিয়ে যেখানে সেখানে আপনারা আলোচনা করবেন না!" চুপি চুপি এই সাবধানবাণী শুনিয়ে গেলেন পাণ্ডাঠাকুর।

খাবো? নিশ্চয়ই খাবো। কি আছে খাবার? লুচি আর বুঁদে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ কারও বাড়িতে বিয়ের বা জন্মদিনের নেমন্তন্ন নয়। নিজেদের পয়সায় কিনে খাচ্ছি! এক কণাও ফেলা চলবে না। যার যতটুকু নেবার আগে থেকে হিসেব করে নিতে হবে। কাল সকালের জন্য দু-একখানা যদি বাঁচানো যায় সেও দেখতে হবে।

খেতে হলে একটু বসতে হয় কোথাও। কিন্তু এখানে বসবার জায়গা দেখছিনে। দোকানীদের ব্যবসাবুদ্ধি নেই। লোকের বসবার জায়গা করলে তবে ত বসে বসে এটা ওটা কিনতে মন যাবে।

একটা নিচু চৌকি মতো রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা উনুনের পাশে এমন জায়গায় যেখানটা ঘরের না-ভিতর না-বাহির। খানিকটা ছাঁচতলা মতো। তাতে আবার ঘরের চাল এত নিচু যে বসলে পিঠ লেগে থাকে চালেই।

এর মধ্যে পাণ্ডা আবার ঘুরে এসেছেন। বললেন, "আপনারা কিন্তু এখান থেকে একা একা আমার বাড়ির দিকে যাবেননা। আমি লণ্ঠন দিয়ে আমার ছেলেকে পাঠাবো। ওর সঙ্গে-হয়ে যাবেন।"

লুচি আর বুঁদে ওজন করে দিয়ে দোকানী দাঁড়িটা এগিয়ে দেয় আমাদের দিকে। আমরা কি দাঁড়ির ওপর থেকেই খেতে শুরু করব? একটা পাতা টাতা কিছু দেবেনা! কাগজ দিলেও তো চলে।

দোকানী ও সব কথা কিছুই ভাবছেনা। বলছে, "নিন আপনাদের জিনিস" "

বারে! আমরা নেবো কিসে? গায়ের পোষাক খুলে তাতে নিতে হবে নাকি? কিন্তু তাতে যে তেল লেগে যাবে! তেল চিটে ধুলেও ওঠেনা সহজে!

তেলে ভাজা লুচি আর রসে ডুবনো বুঁদে। কোনোটাই বাদামের মতো নয় যে? বাদাম তো পকেটে রেখেও খাওয়া চলে! দোকানী বাদামই বেশি ভাজে কিনা, কাজেই কাগজ পাতার ধার ধারেনা!

শুধাই, "একটু কাগজ হবেনা ভাই!"

"আমাদের মশায় পাড়াগাঁয়ের দোকান। খদ্দেরই আসেনা তো কাগজ! এটা তো আর শহর নয়—বুঝলেন কিনা!"

একি মুশকিলের কথা! শহরের ওপর সবাই এমন ক্ষেপে আছে কেন? বলি তাই, "পাড়াগাঁয়ে কি কাগজ আসেনা?"

বলে, "আমাদের মশায় ছোট দোকান। জিনিসই আনতে পারিনে পুঁজি কম, তা কাগজ আবার আনব কেমন করে?"

বলি, "কাগজ কিনতে না হয় পয়সা লাগে, পাতা এনে রাখতে পারেননা?"

"পাতাতেও তো লাগে মশায়! সে কি আর বিনে পয়সায় দেবে

"কেন, শালপাতা না রেখে কলাপাতা রাখলেই পারেন! পাড়াগাঁয়ে বাড়ি, কাজেই কলাগাছ তো আপনার নিজেরই আছে।"

"কলাগাছ থাকলেও সকলেরই কি আর থাকে মশায় ?"

দোকানী বোধ হয় প্রমাদ গনল। দু টাকার জিনিস বিক্রি করে সে কি যে ফ্যাসাদেই পড়ল! তবু বলল শেষকালে অতি কষ্টে মুখটা কালো করে, "তাহলে বসুন আপনারা আমি গাড়ি থেকে যোগাড় করে নিয়ে আসি কিছু পাতা টাতা!"

মনে মনে বলি, এ আবার কি ধরনের কথা রে বাবা! এ যে পুকুর খুঁড়ে তবে জল খাওয়াবে বলছে!

লুচি বুঁদে পড়ে আছে পাল্লার ওপর! লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয় একটা মাছি ভন ভন করছে—আর বার বার বসছে খাবারের গন্ধে। চুপচাপ বসেছিলাম এতক্ষণ। একটা কাজ পাওয়া গেল—মাছি তাড়ানোর কাজ। রাত্রিবেলার মাছি, সে যে কি সাংঘাতিক চীজ, সে টের পেতে লাগলাম হাড়ে হাড়ে!

দোকানীর হাই উঠছে ঘন ঘন। বয়স বেশি নয়। তা ছাড়া দেখতেও বেশ হৃষ্টপুষ্ট—তেলতেলে চেহারা। শরীরে শক্তি আছে বোঝা যায়। কিন্তু মুখটা এমন কালো করে রাখে কেন? পরনের ময়লা কাপড়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলে বুঝি! না কি আমাদের ওপর রাগ করে এমন ভঙ্গি ধরে আছে। আমরা উঠে গেলেই বেচারী ছুটি পায় আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপ ফেলে তালা ঝুলিয়ে ছুটতে থাকে বাড়ির দিকে। হয়তো তার নূতন বৌদি ভাত বেড়ে বসে আছে!

পাতা নিয়ে আসছেনা কেন! কত দূরে বাড়ি? কাকে পাঠিয়েছে সে? কোন পথ দিয়ে গেল? পথ তো আমাদের সামনে দিয়ে এই একটি—এ পথে কাউকে যেতে কিছুক্ষণের মধ্যে দেখেছি বলে তো মনে হয়না।

তা হলে কি ধাপ্পা! ভেবেছে, কিছুক্ষণ বসে থেকে ব্যাটারা উঠে যাবে বিরক্ত হয়ে। সেই বা কে জানে!

না। কে জানে সত্যি মিথ্যে। ঐ যে একজন আসছে। একটা লণ্ঠন হাতে। দোকানীর লোক? নিশ্চয় পাতা নিয়েই। কেন বেচারীর ওপর তাহলে ভুল ধারণা করলাম!

না। এ যে পাণ্ডার ছেলে। সিদ্ধবাবা এর নাম দিয়েছে বাবাঠাকুর। সে এসেই বলে, "চলুন বাড়ি যাবেন, বাবা বলে পাঠালেন।"

"আমাদের যে খাওয়াই হয়নি।"

"কেন?"

"দোকানীদাদা পাতা আনতে পাঠিয়েছে কাকে যেন। সে ফেরেনি!"

আমাদের পাশ ঘেঁষে বাবাঠাকুর ঢোকে ভিতরে। দোকানীর সঙ্গে ফিসফাস কি কথাবার্তা হয় তার। তারপর আবার লণ্ঠন হাতে ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে আর ছুটতে থাকে পথে নেমে!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসে সে। কয়েকখানা খড়কে-গাঁথা শালপাতা নিয়ে দোকানের ভিতরে ঢুকে আমাদের কাছে এসে এগিয়ে দাঁড়ায়।

একটা কুকুর কেঁউ কেঁউ করতে করতে ঘর থেকে বেরয়। শুধাই, "কে মেরেছো ভাই এটাকে! কেন মেরেছো?"

"আপনাদের খাবারে ভাগ বসিয়েছিল যে!"

"তাই নাকি? মুখ লাগিয়েছিল লুচিতে?"

বাবাঠাকুর একটু থতমত খেয়ে সামলে নিয়ে উত্তর করল, "যেটাতে মুখ লাগিয়েছিল সেটা নিয়েই পালিয়েছে। অন্যগুলো নষ্ট হয়নি।"

সিদ্ধবাবা বলে, "বুদ্ধি আছে বাবাঠাকুরের সেত আমি আগেই বলেছিলাম!"

পরের দিন পূব দিক ফরশা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রওনা দিতে

হবে এখান থেকে। হাঁটতে হবে একচক্রা গ্রাম অবধি। বীরচন্দ্রপুরের মন্দির আর প্রভু নিত্যানন্দের গর্ভাবাস স্থান দেখে যেতে হবে এই বারেই। ক'ক্রোশ হবে এখান থেকে কে জানে। গ্রামে আবার ডালভাঙা ক্রোশ। তিন ক্রোশ পথহাঁটার সময় চলে গেলেও এক ক্রোশ পথ এগোনো যায়না। পথশ্রমে কমতি নেই। হাঁটতে হাঁটতে ক্ষিধে পেয়ে যায়। তখন কিছু মুখে দিতে হলে সে পাবো কোথায়? এ বেলার বরাদ্দ থেকে কিছুটা তুলে রাখতে হয় তাহলে।

সবটা খাবার চার ভাগ করা গেল। তিন ভাগ তিনজনে নিয়ে চতুর্থটা ভাল করে শালপাতায় মুড়ে পুরিয়ার আকারে আমাদের পাশেই রেখে দিল বাবাঠাকুর।

বেশি খেতে পারা যায়না এসব জিনিস। আবার ক্ষিধেও থেকে যায় যেমনকার তেমন। ভাতের জায়গা কি লুচিতে ভরে কখনও। খালি পেট যেন খালিই থেকে যায়। মাঝখান থেকে টাকা দুটো খসে গেল ট্যাঁক থেকে। মুখে উঠতে থাকে বাদাম তেলের গন্ধ মাখা ঢেকুর। কিন্তু দোকানীতো বলেছিল খাঁটি শর্ষের তেল দিয়েই ভাজবে!

সিদ্ধবাবাকে বলি কথাটা। বলে, "এটুকু মিথ্যে না বললে ব্যবসায় চলেনা যে! লোকটা দোকান নিয়ে বসেছে। এ তো আর সাধুবাবার আশ্রম নয়! ওর সংসার আছে যে। সংসার চালিয়ে রাখতে পয়সার দরকার। সে পয়সা উপায় করতে নানা রকম ফন্দিফিকিরই চাই। সব সময় সত্যিকথা বললে তার সংসারতো চলবেনা!"

অবাক হয়ে বলি, "এ তুমি কি বললে বাবা! সত্যি কথা বললে ব্যবসায় চলেনা এ কথা কে বলেছে! গান্ধীজির আত্মজীবনী পড়েছ? তিনিও তো তাঁর ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় মিথ্যের আশ্রয় নেননি।"

"কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন মিথ্যে ঢুকেছে তখন? তারপর আর ক দিন করলেন ব্যারিষ্টারি?"

বলি, "তুমি ঠিক খবর জানোনা। আবার পড়ে দেখো ধৈর্য ধরে সে বইটা।"

গলা শুকিয়ে উঠেছে। জল চাই। খদ্দের ঠকানো চায়ের গেলাসে করে এনে দিল জল। পোয়াখানেকের বেশি হবেনা। খুশি না হয়ে বলি, "দাদা, এতে আমার আচমনও হবেনা যে! আরেকবার দেবেন?"

আরেকবার এনে দিল। কিন্তু তাতেও আমার দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে লাগানো লুচির কুচি জলে ধুয়ে গলার তল হলনা। খালি গেলাসটা বাড়িয়ে দিয়ে বলি, "যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আরও একটি গেলাস জল দিন দাদা!"

দোকানী অনিচ্ছায় ধরেছিল। ভালো করে হাতে না পেতেই সে আমি ছেড়ে দিলাম বুঝি। গেলাসটা পড়ে গেল মাটিতে। বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। আরও চার আনা দণ্ড লাগল হয়ত!

না ভাঙেনি। ভ্যাগ্যিস পাড়া গাঁ। মাটির মেঝে তাই রক্ষে। বলি জোড়হাতে "রাগ করবেননা দাদা, বিরক্ত করছি আপনাকে। কিন্তু এইত একবেলার পরিচয়! জীবনে কি আপনার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে?"

রুমালে মুখ মুছে নিয়ে সবাই উঠে পড়ি। পথে নামি আবার। হেঁটে চলি। পিছন থেকে ছুটে কে একজন হঠাৎ সামনে দাঁড়ায়। আঁৎকে উঠি। তাকিয়ে দেখি, হাতে তার এক গেলাস জল!

দোকানী দাদাটি। মুখ কাঁচুমাচু করে বলে, "নিন, পিপাসা নিয়ে যেতে নেই!"

অবাক হয়ে তাকাই তার মুখের দিকে। এ মুখ তো সে মুখ নয়! সকল বিবাদ হঠাৎ তার এমন প্রসন্নতায় পরিণত হল কোন মন্ত্রে!

গেলাসটা হাতে নিয়ে চুমুক দিয়ে নিঃশেষ করি সবটুকু জল

চব্বিশ

মন্দির-চত্বর পেরিয়ে যখন নেমে আসছি পাণ্ডার বাড়িমুখো দরজাটা দিয়ে তখন হঠাৎ ব্রহ্মচারী বলে, "সেই পুরিয়াটা কোথায় ?"

বাবাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে ছোটে।

সিদ্ধ বলে, "দেখো, ছেলেটা সারাদিন খেটেছে আমাদের ফাইফরমাশ। রাতের বেলাও পিছু পিছু ঘুরছে। এতটুকু আলস্যি নেই, অভিমান নেই। হাইস্কুলে পড়ে ছেলে—ক্লাস সেভেন না নাইন হয়েছে ওর। কিন্তু আজকালকার ছেলেদের মতো মোটেই নয় ! বাবার কেমন বাধ্য দেখছো ত !"

বলি, "বাবার হয়েই তো আমাদের জন্য এতটা করছে !"

কিন্তু কেন ? আমরা নিজেরাওতো এতটা করিনি বাবার ব্যক্তিগত কাজ। বাবা কাজের কথা বললেই কি রকম মনটা বিগড়ে যেতো। তার চাইতে পাশের বাড়ির পারুলদি কিছু বললে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যেতে কি ভালোই না লাগতো !

বলি "তোমার সংসার আর পাণ্ডাঠাকুরের সংসার তো এক নয়। ছেলে তো দেখে কত দুঃখে কষ্টে ওদের দিন চলে। আপ্‌সে কোনো জিনিসটাই এসে যায়না ঘরে ! তাই বাবা আর ছেলে দুজনেই সংসারের জন্য উপার্জনে সমান পরিশ্রম করতে ওরা রাজি।"

"কিন্তু সংসারে শত অভাব থাকলেও ছেলেরা কি তার জন্য মাথা ঘামায় ?"

সবাই না ঘামালেও কেউ কেউ ঘামায়। তুমি আমি যে তিরিশ দিন আপিসের ঘানি ঠেলছি, সে কোন দায়ে পড়ে ? কটা

টাকার জন্য তো! তা নইলে আমাদের বয়সে কত ছেলে দেশে বিদেশে ঘুরছে আনন্দ করছে। আমরা কই তাতো পারিনে! সংসার অবশ্য আমাদের রোজগার না হলে আটকে যায়না, তবু নিজেরা তো আটকে যাই! নিজের পেটটা আর কারও ঘাড়ে চাপাতে তো লজ্জা! এদেরও তাই। গোটা চাণক্য পরিবার আমাদের তালাবিতদ্বির নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে তার কারণ ওরা আমাদের কাছ থেকে বেশ কিছু আশা করছে!"

কিন্তু আমরা তা দেবো কোথা থেকে?

হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসে বাবাঠাকুর। বলে, "ঝাঁপ ফেলে দিয়ে তালা বন্ধ করছে এমন সময় আমি গিয়ে পৌঁছলাম। ঝাঁপ আবার তুলালাম, ঘরে ঢুকে পুঁটুলিটা খুঁজে নিয়ে এলাম। এই যে নিন্!"

শুধাই, "দোকানী রাগ করলো না!"

"না। ওরা যে আমদের চেনাশোনা লোক। আমাদের যাত্রী এলে সব সময় ওদের দোকান থেকেই কেনাকাটা করে যে!"

মনে মনে বলি, আর কোথায়ই বা যাবে। এইটিতো একমেবাদ্বিতীয়ম্।

পাণ্ডার বাড়িতে ঢুকতেই একটা লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসেন বাবাঠাকুরের পিসিমা! বলেন, "বড় কষ্ট হল বাবুদের। পূর্ববঙ্গের মানুষ! খাওয়াদাওয়ায় কত পরিপাটি জানেন আপনাদের মা দিদিমারা। আমরা তার কতটুকু খবর রাখি! দুপুরে পেলেন প্রসাদ এখানে—সে তো আপনাদের মনের মত হয়নি, সে কি আমি বুঝতে পারিনি ভেবেছেন!"

মনে মনে বলি, বুঝতে পারাটা খুব ভালো। তাহলে চার্জটা একটু কমিয়ে সমিয়ে ধরবে তোমরা! তা না হলে যে আমাদের বিপদ!

বলেই চলেন তিনি, "পেটের ক্ষিদে আপনাদের পেটেই রয়েছে!"

সিদ্ধ বাধা দিয়ে বলে, "না, এ কি বলছেন, তা কেন হবে, আমরা তো দুজনে পুরো পেট প্রসাদই খেয়েছি। শুধু ওই মোহন্ত-ব্যাটা খায়নি! সে কি আর প্রসাদের ভালোমন্দের জন্যে— ও ব্যাটা আর কোথায় কি না কি খেয়েছিল বোধ হয়, তাই।"

তবু বলেন, "সে যা হোক, আমার মনে খেদ তো রয়ে যাবেই! ভেবেছিলাম, রাত্রিবেলা আপনাদের আবার প্রসাদ পেতে বলবো, কিন্তু আপনারা রাজি হলেন না। কিন্তু বাবারা, একটা গোটা রাত এই ক'খানা লুচি মুখে দিয়ে আপনারা কাটাবেন কি করে শুনি!"

ময়লা থান পরনে বটে, দেখতেও ময়লা, কিন্তু ভিতরে তাঁর এত সব ফরশা কথার পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে!

ব্রহ্মচারী বলে, "শুনলে তো!"

বলি, "বুঝলে না, নারী ছলনাকারী। পুরুষরা ওদের হাতের পুতুল। ওদের একটি কথায়, একটু চোখের ঠারে রাজ্য ছাড়তে পারে। আর তুমি অজানা পথিক কোন ছার। পাঁচ টাকার জায়গায় সাত টাকা না দিয়ে বেরও দিকি!"

ব্রহ্মচারী বিরক্ত হয়ে বলে, "তোমার মনে কেবল হিসেবের খেলা চলছে!"

বলি, "ছাখো, বলতে পারো আমাকে হিসেবের খেলা কোথায় নেই? হিসেব ছাড়া কোন কাজটি হয়, আর কোন কথাটি মানুষ হিসেব না করে বলে! যে বেহিসেবী কিছু বলে, তাকে তো লোকে পাগল বলে জানে। বাইরে বাইরে যতোই ছাখো ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য—ভিতরে ভিতরে কিন্তু সবই গণিতেরই ডালপালা। কোনো ইতিহাসেই দু'জন রাজাকে একজন রাজা বলা হয় না। কোনো ভূগোলেই দুটো দেশকে একটা দেশ বলে না। কোনো সাহিত্যেই পাঁচ মাত্রার ছন্দকে তিন মাত্রার বলে না। তেমনি হিসেব মতো যদি পয়সা কড়ি পাণ্ডাকে না দাও তাহলে তখন বুঝতে

পারবে মজাটা—সামনে তোমাকে গালাগাল না দিলেও তুমি চলে গেলে তোমাকে যা তা বলবে, অভিসম্পাত করবে, দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাবে, মা, ও ব্যাটার ভালো করো না মা, আমার খেয়ে গেলো, গোষ্ঠীসুদ্ধ সবাইকে খাটিয়ে গেল, কিন্তু দিয়ে গেল না হিসেব করে !"

সিদ্ধ কি উত্তর দেয় শুনব বলে কান পেতে আছি। কিন্তু আচমকা ঢুকলেন এসে পাণ্ডাঠাকুর স্বয়ং ! এইরে, শুনে ফেলেনি তো আমার কথা ! শুনলেই আর কি করব ! ব্রহ্মচারী বড় বড় চোখে মুখ ভারী করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে !

পাণ্ডাঠাকুর একলা আসেননি। হাতে তাঁর একখানি খেরো বাঁধানো খাতা—যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া, তেমনি আবার মোটাও।

বসলেন তিনি আমাদের সামনেই। খাতার বাঁধন দড়িটা খুললেন। আবার হঠাৎ উঠে পড়লেন খাতা বন্ধ করে। বললেন, "আপনারা একটু আসুন এ দিকে ! মানে ভিতরের বারান্দায় !"

সিদ্ধকে বলি, "দেখলে তো, যা বলেছিলাম—একেবারে অক্ষরে অক্ষরে—সঙ্গে সঙ্গে হিসেবের খাতা নিয়ে এসে হাজির ! আমার কথা তোমরা তো গ্রাহ্যই করো না !"

ব্রহ্মচারীকে ডাকি, "ওঠো হে, এবার ট্যাঁক খসাতে হবে। পাণ্ডা খাতা নিয়ে এসেছে—আশা করি দেখতে পেয়েছো !"

ওরা দুজন অচল অটল হয়ে বসেই আছে। ওঠে না কেউ। আমাকে শেষে বলে, "তুমি গেলেই হবে। যাওনা বাবা, দেখো গিয়ে ব্যাপারটা কি ?"

"আমাদের তিনজনকেই যে ডেকে গেল !"

আমি দাঁড়িয়ে থাকি। ওরা দুজনে পাশ ফিরে শোয়।

পাণ্ডার ডাক কানে আসে আবার, "এদিকে একটু আসুন মশায়রা !"

সেই যখন পাণ্ডার বাড়িতে প্রথম ঢুকি তখন যেমন ভয় হয়েছিল তেমনি ভয় হচ্ছে আবার। যাবো তো! পাণ্ডা যেমন হিসেব করবে তেমন তেমন টাকা না দিতে পারলে, কি জানি করবে ব্যাটা —ঈশ্বর জানেন!

মনটা আমার খিঁচিয়ে ওঠে। এই আমার সঙ্গীরা—এরা এখন আরাম করে ঘুমোচ্ছে। বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে আমাকে। কি অদ্ভুত। ওদের কি মন বলে কোনো বস্তু নেই! না থাক! জেদ বেড়ে যায় আমার। আর ডাকবোনা কিছুতেই। এবার কোনোরকমে গিয়ে বাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়! আবার কখনও বেরই এদের সঙ্গে!

পঁচিশ

লণ্ঠনটা টিম্‌টিম্ করছে। পাণ্ডা খাতা খুলে নিয়ে বসেছেন—যেমন করে গদীতে মহাজনরা বসে ভিতরে ভিতরে সুদের আসলের হিসেব নিয়ে। হাতে কলম, পাশে দোয়াত। জিভে আঙ্গুল ঠেকান আর আঙ্গুলে উল্টে যান খাতার মোটা মোটা পাতা আর ঝুঁকে পড়ে দেখেন কোথায় কি লেখা আছে!

আরও এগিয়ে যাই। যেন এক স্বপ্নপুরীতে এক স্বপ্নমূর্তির কাছে এসেছি। হঠাৎ তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান। হাত জোড় করে বলেন, "বসুন বসুন"—বস্তার ওপর কাপড়ের রঙিন পাড় দিয়ে কাজ করা একখানি আসনের দিকে আমার দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করে বলেন, "বসুন, বসুন!"

আমি বসতেই চুপি চুপি আমার পাশে এসে বসে আমার সঙ্গীরা!

পাণ্ডা শুধান, "বলুন আপনাদের কার কি নাম?"

তিনজনে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করি।

ব্রহ্মচারী বলে, "লিখুন ঠাকুরমশাই আমি বলে যাচ্ছি।"

বাধা দিয়ে বলি, "আপনার লিখবার দরকার কি! খাতাটা দিন আমাদের হাতে, আমরা নিজেরাই লিখে দিই যার যার নাম ঠিকানা।"

পাণ্ডা এতে খুশিই হন। বলেন, "সেই ভালো। কিন্তু বাংলাতে লিখবেন আর গোটা গোটা অক্ষরে পরিষ্কার করে লিখবেন। আমি বুড়ো মানুষ যাতে পড়ে বুঝতে পারি।"

নাম লেখা শেষ হয় আমাদের। পাণ্ডা একবার নিজে পড়ে শোনান জোরে জোরে। শেষে বলেন, "ঠিক হচ্ছে তো!"

আমরা বলি, "হ্যাঁ!"

পাণ্ডা বলেন, "আপনাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধু বান্ধব পাড়া-প্রতিবেশী চেনাশোনা কেউ এখানে আসতে চান তো পাঠিয়ে দেবেন। লিখে নিন না আমার নামটাও। কই দিন আপনাদের নোট বই—আমি নিজেই লিখে দিচ্ছি।"

বলি, "আমরাই লিখে নিচ্ছি—বলুন আপনার নাম ঠিকানা।"

পাণ্ডার নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে আমরা নোটবই বন্ধ করি। পাণ্ডাও তাঁর খাতা বন্ধ করে দড়িটা খাতার গায়ে জড়াতে জড়াতে বললেন, "এবারে আপনারা গিয়ে একটু ঘুমোন। সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে বিশ্রাম মোটে আপনাদের হয়নি। যদি মায়ের ভোগের প্রসাদ পেতে চান তাহলে তো আবার জাগতে হবে রাত দুপুরে!"

ব্রহ্মচারী বলে, "মায়ের আসল রূপ দেখাবেন বলেছিলেন যে!"

"দেখতে চান তো দেখবেন। কিন্তু আপনারা ঘুমোবেন কোথায়? আমার বাড়িতে? এই ঘরেই?"

বলি, "তা ছাড়া কি অন্য কোথাও আর ঘুমোবার জায়গা আছে বলছেন?"

"আছে! কিন্তু সে কি আপনাদের পছন্দ হবে!"

ব্রহ্ম বলে, "মন্দিরের সামনে শুয়ে থাকি যদি।"

"তা হয়তো পারেন। কিন্তু মশা কামড়াবে যে। মশারি টাঙ্গাবার ব্যবস্থা ওখানে কিছু নেই কিনা। মশা কামড়াক, আর আমি গাল খেয়ে মরি।"

"তা হলে? আর কোথায় জায়গা দিতে পারবেন আপনি?"

পাণ্ডা একটু ভেবে নিয়ে তাঁর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁরে, ন'বতের ওপরে ওদের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেনা?"

"কেন পারবোনা?"

"যান তাহলে আপনারা। ও নিয়ে যাক ন'বতের ওপর। জিনিসপত্র এখানেই থাক। শুধু বিছানা আর মশারিটা নিয়ে চলে

যান। ওখানটা বেশ ছোট্ট ঘরটি আছে, নিরিবিলি নিরাপদে থাকবেন। তা ছাড়া মন্দিরও কাছেই। ভোগের সময় হলে আপনাদের ঘুম ভাঙবে শঙ্খঘণ্টার শব্দেই।"

বলি মনে মনে, জিনিসপত্র এখানে রেখে যাচ্ছিনে বাবা।

থলিঝুলি সব নিয়েই বেরই দুর্গা বলে।

পাণ্ডা বলেন, "সব পোঁটলাপুঁটলি কেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ?"।

বলি, "এতে কম্বল আর মশারি ছাড়া অন্য কিছু জিনিসই নেই।" চট করে কথাটা বলেই আবার মনে মনে ভাবি, এ কি করলাম, পরে যদি কিছু একটা হারানো যায়, তখনতো আর বলতে পারবোনা যে এই ছিল ওই ছিল আমার ঝুলিতে।

আবার ঢুকি মন্দির-চত্বরে। যেতে থাকি সেই পথের দিকে, যে পথ দিয়ে প্রথম ঢুকেছিলাম। পথটার মুখে গিয়ে বাবাঠাকুর বলে, "দাঁড়ান এখানেই।"

একটু ডান দিকে বেঁকে সে উপরে উঠে যায় একটা সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে।

"শুধাই, এই নাকি ন'বত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আপনারা একটু পরে আসবেন। ওখানেই দাঁড়ান। আগে আমি এখানটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে নিই।"

বলি, "না, না। সে আমরাই ঠিক করে নেবো। তুমি 'নেমে এসো। শুধু ঝাঁটাটা ওখানে রেখে এলেই চলবে।"

আমরা তিনজনেই চলে যাই ওপরে। তিন হাত পাঁচ হাত কামরা একটি। জানলা নেই। দরজা নেই। জানলার বদলে ফাঁক আছে, যেমন থাকে রান্নাঘরে। দরজার বদলে মোটা মোটা লোহার শিক লাগানো একটা আটকা আছে—কে জানে কার বাড়ির সদর থেকে এটা তুলে নিয়ে এসে এখানে রেখে দিয়েছে। ভীষণ ভারী ওটা ঠেলে নড়াতে শক্তির দরকার। পাণ্ডা ঠাকুর

বলেছিলেন, নিরাপদ জায়গা, সে কি সদরের এই ছিন্ন ডানাটাকে মনে করেই ?

লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পাই বিড়ির পোড়া টুকরোয় ন'বতটি বোঝাই। তা ছাড়া আছে ইঁদুর, ছুঁচো আর টিকটিকির ভুক্তাবশেষ —আর পুরনো পচা গন্ধ। গন্ধটা খুব টাটকা নয়—তাই কোনরকমে দাঁড়িয়ে থাকতে পারা যাচ্ছে। বাবাঠাকুরকে বলি, "ঝাঁটা কোথায় ?"

সে বলে, "ঝাঁটা এখানে ছিল, কিন্তু এখন দেখছিনে।"

বলি, "একখানি ঝাঁটা তোমাদের বাড়ি থেকে নিয়ে এসোগে। আমরা তো জানি তুমি ঝাঁটা নিয়েই এসেছো! দেখছোনা যা আবর্জনা, এর ওপর বিছানা পাতা চলবেনা কিছুতেই।"

মুখ দিয়ে কথা বেরতে যা দেরি। বাবাঠাকুর ছুটেই গিয়েছে বাড়িতে। লণ্ঠনটা নিয়ে গেলো। বলল অবশ্য, "আপনাদের জন্য একটা মোমবাতি নিয়ে আসবো।"

সিদ্ধবাবা বলে, "দেখো, ছেলেটার সত্যি বুদ্ধি আছে—আমরা এখানে রাত্তিরে থাকবো, একটু আলোর ব্যবস্থা চাই। সে কথাটা আমাদের ভাবা উচিত ছিল। তা না, সে ভাবনাও ওই বাবা-ঠাকুরের। যেমনি সেববাপরায়ণ, তেমনি সহজ মন!"

ব্রহ্ম বলে, "কিন্তু ব্রাহ্মণের ছেলেকে দিয়ে ঘর ঝাঁট দেওয়ানো চলবেনা।"

বলি, "বুঝে দেখো। সে কি আর সত্যি ব্রাহ্মণের ছেলে। কথায় বলে, জন্মানাং জায়তে শূদ্র, সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে। ব্রহ্মং জানাতি ব্রাহ্মণঃ। এই ছেলে কি ব্রহ্মকে জানে! আর সে যে এসব কাজ আমাদের জন্য করছে সেকি ব্রাহ্মণের মন নিয়ে করছে। সেবা তো শূদ্রের কাজ। তা ছাড়া আমরা অতিথি। ব্রাহ্মণ হোক শূদ্র হোক সকলেরই কর্তব্য অতিথির প্রতি সমান।"

বাবাঠাকুরের হাত থেকে ঝাঁটা নিয়ে ব্রহ্মচারী লাগলো ঘরটা

ঝাঁটাতে। যত ঝাঁটায় ততই আবর্জনা আর ধুলো বেড়ে ওঠে। একটুকুনি কামরা—তা থেকে হাওয়া সব উধাও হয়ে যায় ধুলোর হাতে ভার ছেড়ে। দম বন্ধ হয়ে আসে আর কি! জল ঘাঁটলে যেমন কাদা ওঠে, এও তেমনি হল।

সিদ্ধ বলে, "বুদ্ধিটা ভালো হয়নি। তার চাইতে যেমনকারটা তেমন রেখে দিলেই হত। কত বছরের ময়লা এতে জমে আছে কে জানে! একেবারে চাপ বেঁধে আছে। ঝাঁটার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন মেঝে ফুঁড়ে বেরচ্ছে!"

বাবাঠাকুর চলে যায় আর বলে যায়, "মায়ের ভোগের সময় যখন হবে তখন এসে আপনাদের জাগিয়ে তুলে আমি নিয়ে যাবো মায়ের মন্দিরে।"

ওপর থেকে নেমে গেছে সে নিচে তখন খেয়াল হল দেশলাই নেই। সিদ্ধবাবা ডাকে, "বাবাঠাকুর বাবাঠাকুর!"

বাবাঠাকুর ফিরে আসে আবার। দেশলাইএর ফরমাশ নিয়ে আবার নেমে যায় দুপ্ দাপ্ করে সিঁড়ি বেয়ে।

বাবাঠাকুরের দেওয়া দেশলাইএর দৌলতে মোমবাতিটা জ্বেলে নিয়ে আমরা বিছানা পাতি। শতরঞ্চির ওপর পরনের কাপড় দু ভাঁজ করে দিই। কম্বলটা থাক শেষরাত্তিরের সম্বল।

এখন মশারি টাঙ্গাবার কি হবে? এটাতো আর শোবার ঘর নয় যে এখানে মশারি টাঙ্গাবার ব্যবস্থা থাকবে। পূজোর সময় এখানে বসে বাদ্যকররা বাজনা বাজায়। তার প্রমাণও একটা রয়েছে ঐ যে কুলুঙ্গিতে। ডুগডুগিই হবে।

আমি আর ব্রহ্মচারী এক বিছানায়। সিদ্ধবাবার অন্য মশারি। আমার মশারির কোণা কোথায় বাঁধবো ভাবি। আমাকে দিয়েছে দরজার মুখে। ভালোই হল, সেই যে ভাড়াটে সদরটা রয়েছে ওটার শিকের সঙ্গে বেঁধে দিলাম মশারির দুটো কোণা আর বাকি দুটো আটকালাম সিদ্ধর মশারির দুই কোণায়। তেমন জুতসই হলনা।

তবে মশা এখন খোলামাঠের চাইতে একটু কম কামড়াবে। তা ছাড়া মনের সান্ত্বনাই তো আসল—মশারির নিচে শুয়েছি! মশা কামড়ালেও মনে হবে চামড়ায় চুলকোচ্ছে!

পড়তে না পড়তেই সিদ্ধবাবা নীরব। ব্রহ্মচারীরও নাক ডাকে। শুধু আমার চোখ আরও বড় বড় হয়ে ওঠে। সারাদিন যা যা ঘটেছে সব এসে মনের মধ্যে কিলবিল করতে থাকে। দুর্গা নাম, রাম নাম, তারা নাম পর পর জপ করে চলি। চোখ বুজে মূর্তি ধ্যানে আনতে চাই, কিন্তু মনে ওঠে, পাণ্ডাঠাকুরের সেই উক্তি—যদি এখন বলি সে কথা, তাহলে ভয় পাবেন, রাত্তিরে ঘুমোতে পারবেন না! শ্মশানের জঙ্গলে সেই যে তিনটে মানুষ ঢুকে গেল, ওরা কি এখনও ওই জঙ্গলের ভিতরই রয়েছে? আমরা যে এখানে শুয়েছি, ওরা কি সে খবর জানে? যদি জেনে থাকে, যদি এসে ঢোকে এখানে?

তা হলে? তা হলে? তা হলে? ভাবতে ভাবতে আমার মাথার ভিতরে কি রকম সব চিন্তা এলোমেলো হয়ে যায়। যেন কানে কাদের পায়ের শব্দ আসছে। মাথাটা একটু তুলে উৎকর্ণ হয়ে থাকি উৎকণ্ঠা নিয়ে। হ্যাঁ, দুপ্‌দাপ্‌ পায়ের শব্দ তুলে কারা যেন যাচ্ছে! না কি আসছে? এসে উঠছে এখানটাতে? কোনো বাধা তো নেই পথে। যে কেউ ইচ্ছে করলেই ঢুকে পড়তে পারে। না আছে দরজা না আছে শিকল।

আমি উঠে বসে পড়ি।

জগতের সকল ভয় একসঙ্গে এসে আমাকে জাপটে ধরেছে। আচ্ছা, ওরাও তো আমার সঙ্গেই ছিল। ওদের মনে কি এতটুকু ভয় ঢোকেনি! কেন? ওরা হয়তো অতো তলিয়ে ভাবে না, বিচার করে না। ওরা কি তাহলে আমার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকে। পথ চলতেও আমাকে আগে ঠেলে দেয়, কারও সঙ্গে কথা বলতে হলেও সে আমাকেই আগে যেতে হয়। এই

যে এখানে শুয়েছি, তাও, আমাকেই দিয়েছে দরজার মুখটাতে। কেন ?

ওরা কি আমাকে আপদ মনে করে ! আমাকে বিপদে ঠেলে দিয়ে কি ওরা সুখ পায়। এখন চোর ডাকাতই আসুক, ভূতপ্রেতই আসুক—প্রথমটা তো আমাকেই লড়তে হবে ওদের সঙ্গে। কিন্তু আমার সারা শরীর যে রকম কাঁপছে, আমি তো কোনো অপরিচিত প্রথম ডাকেই মূর্ছা যাবো মনে হচ্ছে।

ছাব্বিশ

ভূত আর ভূতের কথা দিনের বেলায় অতি তুচ্ছ গল্প! কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারিনে ভূত আছে! কিন্তু রাত হলে আর অন্ধকারে একলা একলা পথ চললে বা কোথাও অচেনা জায়গায় একলা থাকলে ভূতের কথাটাই বেশি মনে হয়। এমন অন্ধকার যদি থাকতে পারে, তাহলে ভূত না ই থাকবে কেন!

কল্পিত যত সব ছবি এসে কিলবিল করে চোখে। কিছুতেই সামলাতে পারিনে নিজেকে। দুঃখে শুনেছি মানুষের ঘুম আসে চোখে। কাঁদতে কাঁদতে ছোটো ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়ে দেখেছি। ভয় দেখিয়েও তো অনেক শিশুকে ঘুম পাড়ানো যায়। কিন্তু আমার বেলায়? আমি যে এত ভয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, তা ঘুম তো আসেনা আমার চোখে! স্মরণ করি মাকে, ঠাকুমাকে ছোটবেলা যেমন করে ওঁরা আমাকে ঘুম পাড়াতেন ঠিক সেই অবস্থাটা দেখা দিচ্ছে মনের মধ্যে। আমি কাঁপা গলায় আওড়াচ্ছি তাঁদের মুখের ঘুমপাড়ানি ছড়া ঃ

ঘুমপাড়ানি মাসিপিসি আমার বাড়ি যাইও
বাটাভরা পান দিমু গাল ভইরা খাইও
আমার সোনার চোখে একটু ঘুম দিয়া যাইও!

মনে মনে নয়, জোরে জোরে চেঁচিয়েই বলে চলি—ঘুম পাড়াবার জন্য নয়, ভয় তাড়াবার জন্য।

হঠাৎ একটা হৈ চৈএর শব্দ কানে আসে আমার ছড়ার সুর ছাপিয়ে। যেমন হৈ চৈ করেছিল সেই তিনজন যখন উঠে চলে যায় জঙ্গলের দিকে—অবিকল তাদেরই গলার স্বর যেন!

চুপ করে কান পেতে থাকি! ব্যাপারটা ভালো করে ট্রেস করবার জন্য মশারি তুলে তাকাই দক্ষিণ দিকে। প্রথমে দৃষ্টি যায় দূরে—ওখানে কিছু দেখা যায়না, শুধু অন্ধকার—ঝাপসা ঘুরঘুট্টি মন বলে, ওখানেই নদীটা পেরিয়েছিলাম। তারপর শ্মশানের গাছপালায় সব মিশে গিয়েছে এক সঙ্গে, রাত্রির কালো রঙ আর গাছপালার সবুজে কোনো তফাৎ বোঝা যায়না। ওই রহস্যময় অন্ধকারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কি সেই তিনটে মূর্তি!

এতক্ষণে নিশ্চয় বেরিয়ে এসেছে। ওরাও তো মানুষ! চোখ পড়ে সেই দোকানটাতে। ওটা কি? আলো? না? হ্যাঁ। তাইতো। কিন্তু দোকানী তো আমাদের লুচি বুঁদে খাইয়েই ঝাঁপ বন্ধ করে বাড়ি চলে গেল।

এত রাত্তিরে সে আবার ফিরে এসেছে নাকি? ফিরে এসেছে কেন?

যা খুশি করুকগে। ফিরে এলো কি এলোনা তা নিয়ে আমার অত ভাববার কি দরকার! আমার কোনো ক্ষতি না করলেই হল! কিন্তু ভয় ছাড়ছেনা মনের। হঠাৎ মনে হয় পরমহংস-দেবের কথা—জোরে হাততালি দিয়ে হরিনাম করবি, তাহলে সব ভয় পালিয়ে যাবে, যেমন করে বাদুড় পালায় অন্ধকারে গাছ ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণপণ জোরে হেঁকে উঠলাম, 'হরিবোল'!

কে যেন নিচে থেকে আমার কথার প্রতিধ্বনি করলো—'হ রি বো ল'...

ভেংচালো না তো! আচ্ছা বোকামি করলাম। হয়তো কেউ জানতোনা যে আমরা এখানে আছি। এবার হাততালি দিয়ে আর হরিধ্বনি দিয়ে জানিয়ে দিলাম। সত্যি কি সাংঘাতিক ভুল করলাম! এমন ভুল করলে মানুষ নিজেকেই নিজে ক্ষমা করতে পারেনা। ইচ্ছে হল সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে পড়ি ন'বতের ওপর থেকে একেবারে পথের ওপর!

কানে আসছে হারমোনিয়ামের সুর। আর সঙ্গে সঙ্গে মোটা গলায় ভাঙ্গা কাকস্বরে গান ঃ

লে সখি দে ভর পিয়ালা দারুপিন···

বার বার কসরত করে করে একটা পদই টানে। একজন গায়, অন্য একজন বাজায়, আর বাদবাকি সাঙ্গোপাঙ্গোরা নিজেদের শরীরেই তবলা বায়ার বোল তোলে ঃ

টাকা ডুম···টাকা ডুম, ডুম ডুম···টাকা ডুম···

একেবারে কানের কাছে এসব ব্যাপার চলছে। ন'বতের ঠিক নিচেই মন্দির-চত্বর থেকে বেরবার দরজা। ঐ দরজা থেকে পা বাইরে বাড়ালেই পথ। পথ পেরিয়ে দোকানটা। দোকানের পর ও দিকে 'শান্তি আশ্রম,' তারপর 'ক্ষ্যাপাসঙ্ঘ,' তারপর শ্মশানের মুখ। ঠিক কোন জায়গাটাতে গান বাজনা চলছে সে ঠাহর করতে পারিছিনে আমি কিছুতেই।

এখন আর দোকানে আলোও দেখতে পাচ্ছিনে। কিন্তু গানের কলি আর হারমোনিয়ামের বাজনা চলছে আগের মতোই!

আবার শুয়ে পড়ি। একেবারে শরীর ছেড়ে দিয়ে মড়ার মতো হয়ে যাই। যেন আমি আর আমি নেই এই ভাবে শরীরটাকে ছড়িয়ে দিই বাইরের অন্ধকারে গাছপালায় মানুষে পশুতে চেনা অচেনায় আকাশে বাতাসে চন্দ্র তারায়!

তবু কথারা আসে, চিন্তারা আসে মগজে ঢুকবে বলে। আমি বলি এখানে কোথায় আর ঢুকবে, আমার ঘর ভেঙ্গে দিয়েছি, আমি ছড়িয়ে পড়েছি সর্বত্র!

চমকে উঠি সেই লোহার সদরটা নাড়ার শব্দে। উঠে বসেই পড়ি। কাঁপা গলায় শুধাই, "কে? কে তুমি? কি চাই?"

নরম গলায় উত্তর হয়, "মায়ের পূজো হচ্ছে, দেখবেন তো উঠে আসুন!"

"মায়ের পূজো এখন! কত রাত হবে!"

"বারোটার মতো!"

আশ্চর্য! বলে কি! আজকের রাতটা তাহলে লম্বা হয়ে গেল কার টানে! সেই যখন শ্মশানে বসেছিলাম তখনই পাণ্ডা বলেছিলেন, অনেক রাত হয়েছে। তারপর দোকানে বসেও হল অনেক রাত, আবার পাণ্ডার বাড়িতে—সেখানেও তো কম রাত হয়নি! তারপর তো কতক্ষণ ধরে এখানে যুদ্ধ করছি ঘুমের সঙ্গে! তবুও রাত বারোটা পেরোয়নি!

সঙ্গীদের নাম ধরে ডাকি। সাড়া দিয়ে ওরা আবার পাশ ফিরে শোয়। এখন গায়ে খোঁচা দিলে ওরা ভীষণ চটে যাবে। কাজেই থাক। ডেকেই চলি, "ওঠো সিদ্ধবাবা, ওঠো ব্রহ্মচারী। মায়ের আসল রূপ দেখবে তো ওঠো, জাগো!"

বাবাঠাকুর চলে যায় মন্দিরের দিকে! আমার ওপর ভার রেখে যায় ওদের তুজনকে নিয়ে যাবার জন্য। আমি ওদের ডেকে তুলতে পারিনে।

আমি একাই নেমে যাচ্ছিলাম। তখন পিছন থেকে ব্রহ্ম ডাকে, "দাঁড়াও, আমি যাচ্ছি। সিদ্ধ বলে, আমিও!"

এখন দেখছি, ওদের না ডাকলেই ছিল ভালো। একসঙ্গে তিনজন চলে গেলে ঘরটা যে খালি পড়ে থাকবে। বলি, "কি হে, ঘরটা খালি পড়ে থাকবে আর জিনিসপত্র এমনি থাকবে অরক্ষিত অবস্থায়!"

সিদ্ধ বলে, "এখান থেকে ওখানে ত—উঠনটুকু পেরিয়েই মন্দির! কে আসবে আমাদের কাঁথা কম্বল চুরি করতে?"

"আসবেনা জানি, কিন্তু যদিই এসে যায় আর মশারিটা খুলে নিয়ে যায়, তাহলে? যাবে তো পনেরো টাকার জিনিস? ইটালিয়ান নেটের সিঙ্গল্! বাবা, কত কষ্টে একবার করেছি। তু বার এ জিনিস কিনতে পারি তেমন ক্ষমতা তো নেই!"

"তাহলে তুমি বসে থাকো, মশারি পাহারা দাও, আমরা দেখে আসি মায়ের আসল রূপ!"

আমার সম্মতির অপেক্ষা না করে ওরা বেরিয়ে পড়ে দুজনেই।

চলেই যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে দেখছি। সংসারে এমনি হয়! ওদের আমি ডেকে ডেকে তুললাম। আর ওরাই এখন আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে! সেই গানটা আবার মনে পড়ে—আমি আগে এসে পাছে রইলেম বসে…। কুনকুনিয়ে আমি গেয়ে চলি আর মোমবাতিটা জ্বালি। ওপরে তুলে ধরি। ওদের উদ্দেশে বলি, "পথ দেখা যাচ্ছে তো!"

ওরা উত্তর দেয়, "হ্যাঁ!"

সত্যি ওরা সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়েছিল। আমার জন্য অপেক্ষা করছিল না কি?

আমি ভাবি, এসেছি তারাপীঠ দেখতে, তারাপীঠের সব খুঁটিনাটি জেনে যেতে। মশারি পাহারা দিতে তো আসিনি আসলে! ওরা দেখবে মায়ের আসল রূপ আর আমি হব বঞ্চিত! না সে হবেনা। মশারি শুধু আমার একলার করে নেবেনা চোরে, ওদেরও যাবে সব!

ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিয়ে আমিও সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচে। ছুটে উঠি গিয়ে মন্দিরের বারান্দায়!

মন্দির নীরব। শঙ্খ বাজেনা, ঘণ্টা বাজেনা, কাঁসর পিটোয়না কেউ, ছোট ছেলেদের আনন্দ নেই কাঁসর বাজানোতে? ওরা আসেনা কেন? এ কি রকম পূজো!

পূজো নাকি হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর যখন বেজেছিল তখন আমরা নাকি ছিলাম ঘুমে অচেতন!

ব্রহ্মা বলে, "মন্দিরের দরজা যে এখনও খোলা রেখেছেন পাণ্ডাঠাকুর এই ঢের!"

শুনলাম, পূজারীঠাকুর নাকি খুব চটেছেন আমাদের ওপর। আমাদের পাণ্ডার ওপর।

বলি, "সে তো চটবেনই, আমরা তো তাঁর বাড়িতে উঠিনি!"

আমাদের পাণ্ডাকে দেখতে পাই—দাঁড়িয়ে আছেন মন্দিরের এক কোণে। তিনি এখন মায়ের মূর্তি স্পর্শ করতে পারেননা। তবু এগিয়ে এসে শুধালেন, "আপনারা তিনজনেই এসেছেন তো? তবে এইবার দেখে নিন মায়ের আসল রূপ! সেই শিলামূর্তি যার কথা আগে আপনাদের বলেছি! দেখে নিন্ ভালো করে!"

মূর্তির কাছে এগিয়ে যায় একটি ফুটফুটে কিশোর। মায়ের পরনের শাড়িটা খুলতে থাকে। খুলতে খুলতে হঠাৎ দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

আমরা ভাবি, দেখানো শেষ হল নাকি? কিন্তু আমাদের যে দেখা হলনা শেষ।

কাছেই দাঁড়িয়েছিল বাবাঠাকুর। বলল, "না, মায়ের মুখোশ-মূর্তি তুলে নেবার কালে দরজা বন্ধ করতে হয়। ছেলেমানুষ কিনা, ভুলে গিয়েছিল!"

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার দরজা খুলে যায়। আমাদের পাণ্ডা বলতে থাকেন, "দেখুন, এই সেই শিলামূর্তি, যা শিমূলতলা থেকে তুলে নিয়ে এসে এইখানে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ইনিই মহামুনি বশিষ্ঠের আরাধিতা তারা মা!"

দেখছি, চোখের দৃষ্টিতে দেহমনের সকল শক্তি একসঙ্গে করে নিয়ে দেখছি—চোখের সামনে আছে শুধু কালোরঙের একখণ্ড পাথর—কি রকম এবড়োখেবড়ো। দেখছি, ভালো করে দেখছি, বুঝতে পারছিনে কোথায় মূর্তির মুখ আর কোথায় তাঁর হাত পা। অবাক হয়ে ভাবছি, এই অরূপ শিলাখণ্ডেই আছে মায়ের আসল রূপ।

মনের মৌন প্রশ্নই পৌঁছল বুঝি সেই কিশোর পূজারীর কানে। সে বলল, "ও, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না বুঝি মাকে! এই যে দেখুন, মায়ের এই হল স্তন আর এই হল শিবের আনন, সদ্যভূমিষ্ঠ শিবকে মা তাঁর স্তন পান করাচ্ছেন।"

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি! আশ্চর্য মুখস্থ করেছে কথাগুলো। বলছে আবার, "মূর্তিটা অবশ্য পরিষ্কার নয়, তবু কল্পনা করে নিলে আর অস্পষ্ট কিছুই থাকেনা।"

দরজা বন্ধ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গেই!

কানে বেজে থাকে তবু পূজারীর শেষ কথটা, "কল্পনা করে নিলেই মূর্তি আর অস্পষ্ট থাকেনা!"

ব্রহ্মচারী চুপচাপ বসে পড়ে। একেবারে আসনে ধ্যানমৌন হয়। পূজারীর কথাটা কি ওরই কানে বেশি করে ঢুকল? ও যেন সত্যি সত্যি মায়ের মূর্তি প্রত্যক্ষ করবার জন্য কল্পনা করতে লেগে গেল।

সিদ্ধবাবা বসে আছে মায়ের দিকে পিছন দিয়ে। বলি, "এ তুমি কি করছো? মায়ের দিকে মুখ করে বসো!"

বলে, "পাগল তুমি, মায়ের মুখ কোন দিকে নেই তা বলতে পারো?"

বলি, "এ যে নানকের মুখের কথা মুখস্থ করে রেখেছিলে মনে হয়। সেই যে মক্কা না কি মদিনায় নানক এক মসজিদের দিকে পা রেখে শুয়েছিলেন, আর তখন এক মৌলবী এসে তিরস্কার করে বলেছিল, এই ব্যাটা, তুই খোদার মসজিদের দিকে পা রেখেছিস কেন? নানক বিনয়ের সঙ্গে বলেছিলেন, দয়া করে পা দুখানি যেদিকে খোদা নেই, সেই দিকে ফিরিয়ে দিন। মৌলবীর চৈতন্য হয়েছিল তাতে। কিন্তু তোমার কথায় কি আমার চৈতন্য হবে?"

সিদ্ধবাবা খোঁচা লাগায় আমার পিঠে! তাকাই আমি তার মুখের দিকে। ইশারা করে বলে, "শোনো ইনি কি বলছেন!"

বিকেলবেলায় যাঁকে বশিষ্ঠ আখ্যা দিয়েছিল সিদ্ধ সেই শাদা দাড়িগোঁফওয়ালা মানুষটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে হাত পেতে বলছেন, "বাবা, আমরাও কিছু পেয়ে থাকি। সারা দিন ধরে আশা করে বসে আছি বাবারা। নিরাশ কববেননা।"

সিদ্ধবাবার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হতে চলল! সত্যি সেই বশিষ্ঠ এলোই শেষ পর্যন্ত আমার কাছে!

আরেকজনের কণ্ঠস্বর কানে আসে, "দেখুন, আজকে আমাদেরই পালি ছিল। আমাদের দাবি আরও বেশি!"

তাকিয়ে যার মুখ দেখলাম এর আগে কখনও তাকে এখানে দেখিনি।

কাকে কি বলবো মনে মনে ভাবছি এমন সময় কানে এলো আরেকজনের নিবেদন, "মনে করে দেখুন মশায়রা, আমারই সঙ্গে আপনাদের প্রথম দেখা হয় কিনা। আমিই তো আপনাদের এগিয়ে নিয়ে আসি এখানে, আর ও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আপনারা ভদ্রলোক, অবশ্যি বিবেচনা করবেন!"

চেয়ে দেখি সেই সুদর্শন পাণ্ডা। শিকারে ব্যর্থ বিষণ্ণ বদন কথা বলতে বলতে যেন ভেঙে পড়েছেন একেবারে!

ওঁর কথা ভাবা শেষ হতে না হতেই আরেক বুড়ো এসে দাঁড়ালেন আমার সামনে। জোড় হাত কপালে ঠেকালেন। আমিও প্রতিনমস্কার করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটু অপ্রস্তুত হলাম—ইনি হয়তো পাণ্ডাকে নমস্কার করেছেন আর সেটা নিতে গেলাম আমি?

"চিনতে পারলেন বাবু? সেই যে বিকেল বেলায় কথা হয়েছিল আপনার সঙ্গে?"

ও, হ্যাঁ! তাহলে ভুল করিনি। আমাকেই নমস্কার জানিয়েছেন তিনি। কিন্তু কি কারণে? বৃদ্ধ তিনি, যুবককে হঠাৎ নমস্কার জানাবার কি হল?

বলি, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মনে পড়ছে, আপনিইতো বাঁশবেড়ে ছেড়ে এখানে এসে বাড়ি করেছেন, বলেছিলেন না?"

"ঠিক আপনার মনে আছে দেখছি! আমি কি আর বাড়ি করতে পারি। মা তারা নিজগুণে আশ্রয় দিয়েছেন। জানেন বোধ করি

যে এখানে কেউ ইচ্ছে করলেই বাড়ি করে থাকতে পারেনা, যদি না মায়ের ইচ্ছে হয়।"

বলি, "হ্যাঁ, সে কথা শুনেছি পাণ্ডাঠাকুরের কাছে।"

"শুনেছেন কি শুধু তার প্রমাণ দেখেননি ?"

বলি, "হ্যাঁ, সেও দেখেছি !"

"বেশ ভালো। বেশ ভালো। তা শুনতে পারি আপনারা কখন ফিরে যাচ্ছেন ?"

মনে মনে ভাবি, এর আবার মনে কি আছে রে বাবা ! কখন ফিরে যাবো সে কথা জেনে ওর কি লাভ। তবু বলি, "কাল সকালবেলাতেই রওনা দেবার ইচ্ছে আছে।"

"তা বেশ, তা বেশ, মায়ের নাম নিয়ে পা বাড়াবেন—কোনো আপদ বিপদ হবেনা পথেঘাটে। তবে বুড়োমানুষের একটা কথা রাখতে হবে বাবাজি। আপনি আমার পুত্রতুল্য। বলুন রাখবেন, তবেই কথাটা পাড়ি।"

"আপনি বলুননা। যদি রাখবার সাধ্যি থাকে তাহলে কেন রাখবোনা !"

"একটু অপেক্ষা করুন। দেখি ঠাকুরমশায় আছেন কিনা। কথাটা ওঁর সামনে বলা চলবেনা কিনা !" বলে বৃদ্ধ একটু হে হে করে হাসলেন। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "আসুন, এদিকে আসুন একটু একান্তে। একটু নিরিবিলিতেই বলি আপনাকে !"

আমি তখন মনে মনে খুঁজি ব্রহ্মচারী আর সিদ্ধবাবাকে। ও মা, ওরা যে কেউ নেই কাছে। কোথায় পালালো আমাকে এই বৃদ্ধ বাঘের মুখে ঠেলে দিয়ে !

ইচ্ছে নেই। তবু যেতে হয় বৃদ্ধের সঙ্গে। মন খুঁজে আনে এক ঠকের গল্প ছেলেবেলায় ঠাকুমার কাছে শোনা। সেই ঠকবুড়ো পথ থেকে শিকার ধরে নিয়ে যেতো তার ডাকাত ছেলেদের কাছে।

ছল করে পথে কাউকে দেখতে পেলেই বলতো, বাবা কে যাচ্ছো, আমি অন্ধ, আমাকে একটু পথটা এগিয়ে দিয়ে যাও। এই কাছেই আমার বাড়ি, বাবা, দয়া করে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাও। কথা শুনে পথিকের মন গলত আর সে বুড়োকে নিয়ে যেত বাড়িতে। গেলেই ছেলেরা পথিককে মেরে তার কাছে যা থাকত পয়সা কড়ি সব নিয়ে নিতো। এ আবার সে রকম কিছু নয়তো !

বুড়ো আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসেও আবার এদিক ওদিক তাকায়। এ আবার কি। কানে ফুঁ দিয়ে পরদা ছিঁড়ে দেবেনা তো ?

আমি বলি, "বলে ফেলুন, এতো সংকোচ করছেন কেন ? আমি আপনার ছেলের মতো, বলুন, নিঃসংশয়ে বলুন।"

"বুঝলেন কিনা ! অনেক শরিকের ব্যাপার যেখানে সেখানে দেনা পাওনার বিষয়ে বলা বড় মুশকিল। তবে এ কথা বলতেই হবে, আপনারা যার বাড়িতে উঠেছেন তিনি অতি সজ্জন। তার উপর— এই মায়ের দিব্য দিয়ে বলছি—বাবাজির মায়ের কৃপা আছেই। সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ, সেবাপরায়ণ তিনি। আচারে ব্যবহারে কোথাও এতটুকু খুঁত পাবেননা আপনি। আশা করি এই একটি দিনেই আপনারা তার পরিচয়ও পেয়েছেন।"

বুড়োর কথার স্রোতে বাধা দিয়ে আমি বলি, "হ্যাঁ, তা পেয়েছি। তবে কিছু মনে করবেন না। এই সকালবেলাতেই আবার উঠে ছুটতে হবে আমাদের। যদি অনুমতি করেন তো একটু গিয়ে বিশ্রাম করি।"

"তা ঠিক বাবা, তা ঠিক। তবে আসল কথাটাই আমার বলা হয়নি। এই একটু সময় আমাকে দিন। এই ঠাকুরমশায়ের—"

বাধা দিয়েই বলি, "বুঝেছি আপনার কথা। তাহলে আসি নমস্কার।"

বুড়ো পিছন পিছন ছুটে আসছেন আর বলছেন—"এ কি বাবা, এ কেমন হল, না শুনেই বললেন, বুঝেছি! এ কি কথা বাবা, এমন তো দেখিনি, এমন তো দেখিনি কখনও।"

পিছনে আর ফিরে না তাকিয়ে আমি নেমে পড়ি মন্দিরের ভিত থেকে উঠনে। ছুটেই চলি ন'বতের দিকে। পাণ্ডাদের ছেলেপিলেরাও ঘুম থেকে উঠে এসেছিল।

আশীশ

ওরা কেন এসেছিল? কচি কচি ছেলেপিলেদের কালো মুখ দেখলে মনটা কেমন মোচড় দিয়ে ওঠে। ওদের দারিদ্র্যের জন্যই ওরা এতটা কাঙালপনা করে! ওরা কি নিজেরাই উঠে এসেছে? ওদের বাবা মা পাঠিয়ে দিয়েছে—যাত্রীদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় যদি। স্নেহমমতা তো মানুষেরই থাকে! ওদের কি আর ভিখিরি ভেবে কেউ দেয়! দেয় ওরা তারামায়ের সেবাইতদের সন্তান—ওদের হাতে দুটো পয়সা দিলে তারামাকে দেওয়ার মতো পুণ্যই হয়!

কিন্তু আমার পকেটে যা আছে সব নিঃশেষ করে দিলেও ওদের সকলে পাবেনা। কাজেই চুপচাপ সরে পড়ে ভালোই করেছি।

তবু অনুশোচনা হয়ে চলে মনের ভিতরে। ওদের দরিদ্র ভেবে কৃপার পাত্র ভেবে আত্মপ্রসাদ যে লাভ করছি, আমি কি ওদের চাইতে কম দরিদ্র! তা না হলে আমি কেন দিতে পারিনে একটা করে পয়সা ওদের হাতে! মনটা নিজের ওপর আবার বিমুখ হয়। নিজের অহংকার মূহূর্তে কোন ধুলোর তলায় মুখ লুকিয়ে কাঁদে!

ন'বতে এসে পৌঁছে গেছি যখন তখনও কে একজন ডাকছে। সাড়া না দিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ি ঘরে আর সঙ্গে সঙ্গেই মশারির ভিতরে।

মোমবাতিটা জ্বলছিল। নিবিয়ে দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পাই, "এই যে নিন, মায়ের ভোগপ্রসাদ। একেবারে গরম।"

বলি, "আমি প্রসাদ খাবোনা এখন। কাল সকালে দেখা যাবে। আপনাদের ঘরে নিয়ে রেখে দিন!"

"আপনি না খান আপনার সঙ্গীরা তো খাবেন!"

"ওরা ঘুমোচ্ছে।"

"একটু ডেকে দিননা। এইত এক্ষুনি মন্দির থেকে ফিরলেন। এর মধ্যে ঘুম ওদের নিশ্চয় পাকেনি। একটু সাড়া পেলেই উঠে পড়বেন! সেই যে বেঁটে ভদ্রলোক বলেছিলেন প্রসাদ খাবেন!"

বলিহারি যাই বাবা, প্রসাদ না খাইয়েই ছাড়বেনা। প্রসাদের বিলটাওতো তা নাহলে লটকানো চলবেনা আমাদের গলায়!

বুঝতে পারলাম বেঁটে ভদ্রলোকটিও এর মধ্যেই উঠে বসেছেন। গলা ঝেড়ে নিয়ে তিনি বললেন "কই চৈতন্য, আলোটা জ্বালো দিকি!"

"আমি পারবোনা, তুমিই জ্বালো।"

"দেশলাই কোথায়!"

"ব্রহ্মচারীকে শুধোও।"

"ও ব্রহ্ম, ও ব্রহ্ম! দেশলাইটা কোথায় রাখলে বাবা!"

ব্রহ্ম বুঝি জেগেই ছিল! পরিষ্কার গলায় উত্তর করলো, "দেখো ঝুলন্ত জামাটার পকেটে আমার!"

"ঝুলন্ত জামা তো উপর উপর তিনটে আছে—কোনটার কথা বলছো।"

"খুঁজে দেখে নাওনা।"

খুঁজেও পাওয়া গেলনা দেশলাই। পাণ্ডা ঠাকুর ভোগপ্রসাদ নিয়ে এসে ফিরে যাবেন। এতক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। ব্রহ্মচারী উঠে আমার ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে নিয়ে এলো প্রসাদ। আবার ঢুকে আমার হাতটা টেনে নিল অন্ধকারেই। হাত ঠেকালো একটা মাটির খুরিমতো কিসে। একটু গরমই বোধ করলাম চামড়ায়!

ব্রহ্ম বলল, "দেখলে তো, সত্যি সত্যি, গরম প্রসাদ। কিন্তু আলো না জ্বেলে এখন খাবো কেমন করে?"

"বলেন তো বাড়ি থেকে দেশলাই নিয়ে আসিগে।"

ওমা, পাণ্ডাঠাকুর এখনও দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে? ডেকে বলি, "ঠাকুরমশায়, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। শোন গে একটু যান।"

উত্তর করেন, "আপনাদের কোন কাজ বাকি থাকতে কি আমার চোখে ঘুম আসবে ভাবছেন?"

বলি, ওরে আমার দরদী রে! বলি, আমাদেব আর কিছু কাজ বাকি নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে এখন গিয়ে ঘুমোতে পারেন।

সিদ্ধ বলে, "সারা দিনরাত্রি ধরে আপনাকে কত রকম ভাবেই না খাটাচ্ছি!"

বলি সিদ্ধকে ধমক দিয়ে, "লোকটাকে একেবারে গাছে তুলে দিলে যে। ওর কি এখন পায়ে আর মাটি ছুঁবে। দেখা যাবে সকাল বেলা দক্ষিণা মেটাবার কালে। দেখবো কত টাকা আছে তোমার ট্যাঁকে।"

সিদ্ধ হেসে বলে, "সে ব্যবস্থা তোমার হাতে। আমরা তার কি জানি!"

শালপাতা মুখে চাপা দিয়ে গরমপ্রসাদের খুরিটা জড়িয়ে রেখে দেওয়া হল দেয়ালের গায়ে টেসান দিয়ে।

হঠাৎ কখন চোখ ছেড়ে গেল একটা বিকট শব্দে। একপাটি সদরটা কে যেন গায়ের জোরে ঠেলে সরিয়ে দিল।

এখনও অন্ধকার। রাত পোহায়নি। পট্ পট্ করে এমন সময় মশারির দড়িগুলো ছিঁড়ছে কে?

শুধাই, "কে? কে? ঠাকুরমশায়?"

একটু বলেই গলা দিয়ে আর কথা বেরয়না। চেষ্টা করি তবু আটকে যায়।

আমার পায়ের ওপর অন্য কার পায়ের চাপ পড়ল। শিউরে উঠি আমি। নিশ্চয় অচেনা কেউ ঢুকেছে।

শুধাই, "কে ?" ভয় মেশানো স্বুরে আবার, "কে ?" বার বার "কে, কে, কে ?" ......

কোনো সাড়া নেই। প্রসাদের গন্ধে কুকুর ঢোকেনি তো। চোখ বুজে স্পষ্ট উপলব্ধি করছি একটা কিছুর উপস্থিতি। জানিনে সেটা মানুষ, নাকি ভূতপ্রেত, নাকি জন্তু জানোয়ার। মনে তো আগে থেকে ভূত ঢুকে বসে আছে। তাই এখন চোখ মেলে তাকাতেও ভয়। এ যেন ভূমিকম্পের ভয়ে মাটির ভিতর বসে ঢুকে পড়ে বাঁচবার চেষ্টা।

"শালারা কোথা থেকে এইখেনে এইস্যে মইরেছে।"

মনুষ্য কণ্ঠেরই উক্তি কানে পৌঁছল। চোখ খুলবো নাকি !

কানের পরদা কাঁপিয়ে শব্দ উঠলো,"ডুম্ ডুম্, ডুডুম্ ডুম্, ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুম্...... ।"

একেবারে আমার মাথার কাছে বাজছে একটা ডুগডুগি। মাতালের মতো দিশেহারা হয়ে দুটো কাঠি নিয়ে পিটোচ্ছে গায়ের জোরে, ডুম্ ডুম্ ডুম্—ডুম ডুম্ ডুম্ ডুম্......

কথা বললেও শোনা যাবার কথা নয়। ভাবনা শেষ হবার আগেই আমার চোখ খুলে যায়। যতটা দেখতে পাই মনে হয় মশারি নেই একখানাও আমাদের ওপর। রাত্রির মতোই একটা কালো ছায়া বসেছে আমার শিয়রের কাছটাতে। তার হাত দুটো নড়ছে ছায়ার মতোই।

এ বুঝি ন'বতের বাজনা ? এখানে প্রথম ঢুকে সেই যে দেখছিলাম একটা ডুগডুগি মতো—সেটার সদ্ব্যবহার হচ্ছে বুঝি।

ব্রহ্মচারী আর সিদ্ধবাবার দিকে তাকাই। দু'জনেই চোখ বুজে নির্বিকার। আমার কানের পরদা ফাটো ফাটো। কিন্তু ওরা যেন উপভোগ করছে ডুগডুগির বিকট শব্দ ভোরের বৈতালিকের মতোই।

আধঘণ্টা চলল একটানা ডুম ডুম···ডুডুম্ ডুম্···ডুম্ডুম্···ডুডুম্ ডুম্....

হঠাৎ কে আবার আমার মাথার নিচে হাত চালিয়ে দিলো। আমি লাফ মেরে উঠে বসে পড়লাম। বললাম ভয় পেয়েই, "গলা টিপে দেবে নাকি।"

উত্তর হয়, "এখানে এইস্তে মইরেছো কেনে? ইট্টের টুকরো কটা কইল্লে কি?"

মনে পড়ল, প্রথম ন'বতটা ঝাঁট দেবার সময় ইটের কটা টুকরো ব্রহ্ম বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল!

হাতটা সরিয়ে নিয়ে ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ করতে করতে লোকটা যাহোক বেরিয়ে গেলো। দরজার বাইরে গিয়ে লোহার সদরটা আবার যথারীতি টেনে দিয়ে গেলো।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি অনেক ক্ষণ পর। এখন আর তেমন অন্ধকার নেই। একটু একটু করে ফরশা হয়ে আসছে। এবার নিশ্চয় দিন হবে। বাঁচা গেলো বাবা। রাত্রি এতো বড়োও হয়। এ কি তারাপীঠের মাহাত্ম্য!

কাকের ডাক পৌঁছয় কানে। মনে পড়ে মুরগীর কথা, হাঁসের কথা। মুরগী এখানে নেই। কিন্তু হাঁস ডাকছেনা কেন প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে? এত বড় কুণ্ডের জলে দল বেঁধে হাঁস যদি ডেকে উঠতো—পাঁ···আঁ···ক্···পাঁক্, পাঁক্ পাঁক্, পাঁক্, তাহলে ঐ ডুগডুগির ডুডুম ডুম এর চাইতে অনেক সহজ শোনাতো। তারামায়ের ঘুম ভাঙতো স্বভাবসুন্দর চারণসঙ্গীতে।

উঠে বসি। তাকাই দক্ষিণ দিকে। কয়েক বিঘে জমি দূরেই দ্বারকানদীর জলে ভোরের আলো পড়েছে। নদীতে স্রোত বইছে ঠিক বোঝা না গেলেও তার ধারা রয়েছে আমার মনে জেগে। সেই যে ছেলেটা পয়সা চেয়েছিল নদী পেরোবার কালে, তাকে তো পয়সা দেওয়া হয়নি। আমরা তো একটু পরেই বেরিয়ে যাবো এখান থেকে। তার আগে কি সেই ছেলেটা আবার আসবে! না আসে যদি তাহলে তো ওর কাছে আমরা ঋণী থাকবো! ও আমাদের যে করেই হোক খেয়া পার হতে সাহায্য যে করেছিল সে বিষয়েতো সন্দেহ নেই।

ঊনত্রিংশ

বার বার সেই ছেলেটার মুখ মনে পড়তে লাগলো। সে আমার মনে হঠাৎ বিরাট বড় হয়ে দেখা দিলো। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম! এক্ষুনি তাকে একবার দেখা চাই। তার হাতে সে যা চেয়েছিল তা দেওয়া চাই। তা নাহলে যেন সে আমাকে এখান থেকে যেতে দেবেনা!

কতো কষ্ট পেলাম সারাটা রাত ধরে এই ন'বতের ওপর! কত দুঃখ দুশ্চিন্তা! ভয় কত বার আঁকড়ে ধরলো আমাকে এইখানে। কিন্তু এখন আর একে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছেনা। বার বার মন বলছে, তারাপীঠের মন্দির-অঙ্গনে ন'বতের ওপর বসে এমনি ভোরের আলোয় খুশির জপমালা গাঁথার সময় জীবনে কি আর একদিনও আসবে! দূরে ছড়ানো দৃষ্টি ধীরে ধীরে কাছে নিয়ে এসে ভিতরে গুটিয়ে নেবার চেষ্টা করতে থাকি! সে যে কী কষ্টের, সে কথা কলমে আসবেনা!

আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডাকি, "ওঠো ব্রহ্মচারী, ওঠো সিদ্ধবাবা! সূর্যোদয়ের আর বেশি দেরি নেই। ভুলে গেছ নাকি, দেখা করতে যে যেতে হবে আবার সেই শ্মশানে—সেই যোগীপুরুষের সঙ্গে!"

ব্রহ্ম বলে, "তুমি আর সিদ্ধবাবা যাও। গিয়ে মুখহাত ধুয়ে নিয়ে মায়ের প্রসাদ খাওগে!"

"আর তুমি ?"

"আমি ততক্ষণ জিনিসপত্র পাহারা দিই!"

বলি, "এবার কিন্তু প্রথমেই পাণ্ডাঠাকুরের কাছ থেকে বিদায়

নিতে হবে। তারপর রওনা হয়ে দেখা করব শ্মশানের যোগীর সঙ্গে!"

"তথাস্তু!"

কুণ্ডের জলে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে শুচিশুদ্ধ হয়ে আমরা এবার খাবো গতরাত্রিতে দেওয়া মায়ের ভোগের প্রসাদ। সিদ্ধবাবা পুঁটলি খুলতে খুলতে হঠাৎ হাত থেকে সেটা ছেড়ে দিয়ে লাফ মেরে পালায়!

বলি, "এ তুমি করলে কি?"

"বাবা! যা পিঁপড়ে ধরেছে! আমরা খাবো প্রসাদ আর আমাদের খাবে পিঁপড়েরা। ব্যাটারা কি করে খবর পেলো যে ন'বতের ওপর মায়ের প্রসাদ আছে?"

বলি, "জানোনা কি করে পিঁপড়ে খবর পায়?"

"কি করে পায়? ওদের টেলিগ্রাপ, টেলিফোন, অয়ারলেস ও-সব ব্যবস্থা আছে নাকি?"

"তার চাইতেও ভালো জিনিস আছে ওদের পেটে! ওরা যে জ্যোতিষ জানে!"

"তাই নাকি? সে বিদ্যে ওরা শিখলো কোথায়?"

"খনার নাম শোনোনি?"

"সে আবার কে?"

"মিহিরের পত্নী, বরাহের পুত্রবধূ। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার তুই রত্ন ছিলেন বরাহ আর মিহির—সে কথা তো গ্রামের লোকও জানে। আর খনার বচনের সঙ্গে পরিচয় না আছে কোন চাষীর!"

পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে এর মধ্যেই ব্রহ্মচারী এসে হাজির কুণ্ডের ঘাটে। অবাক হয়ে শুধায়, "প্রসাদ কই?"

সিদ্ধবাবা পুঁটলিটা দেখিয়ে দিয়ে বলে, "ঐ যে পিঁপড়েয় খাচ্ছে!"

"তোমরা খাওনি ?"

"খাবো, আগে পিঁপড়েদের খাওয়া হয়ে যাক।"

"হায় মরণ! পিঁপড়ে কি একেবারে শেষ না করে ছাড়বে! তার আগেই ছাড়াতে হবে ওদের। তাড়াতে হবে!"

"এতে কি হিংসে হবেনা ?"

"আমার মুখের গ্রাস কেড়ে সে খাবে আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবো ? এখানে হিংসের কথা ওঠেনা। পিঁপড়ে ছাড়ানো আর সংসারের মায়া ছাড়ানো একই রকমের। এরা কেউ আপনা থেকে ছাড়েনা, জোর করে ছাড়াতে হয়!"

সিদ্ধ বাধা দিয়ে বলে, "ঠিক হলনা তোমার কথা। সংসারের মায়া জোর করে ছাড়ানো নাকি যায়না। যখন ছাড়বার আপনা থেকেই ছাড়ে। মনে নেই তোমার লালবাবার কথা! এক ভক্ত এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, 'সংসারের এই যে বন্ধন এই যে স্ত্রীপুত্রের প্রতি আসক্তি সে কেমন করে ছাড়ানো যায় ?' লালবাবা হেসে বললেন শুধু একটি ছোট্ট কথা, 'ওরে তোর কি মনে আছে মার্বল খেলা কখন ছেড়েছিস ? সংসারের আসক্তি যখন ছাড়ে ঠিক মার্বল খেলার মতোই ছেড়ে যায়। কখন ছাড়ল মনেই থাকেনা' !"

ব্রহ্ম তবু বলে, "বুড়ো হয়ে কি আর মার্বল কেউ খেলেনা ?"

আমি বলি, "খেললেও তাতে আর আসক্তি থাকেনা। ছোটোবেলা যেমন মায়ের বাবার দাদার দিদির মারধোর খেতে হয় ঐ খেলার নেশার জন্য, বুড়ো হয়ে যে খেলে সে কি আর তেমন পাগল হতে পারে সেই খেলার জন্য!"

ব্রহ্ম বলে, "বেশ, তোমরা মার্বল খেলোনা, আমিই খেলবো। আমি ইচ্ছে করেই ছাড়বোনা আমার মার্বল খেলা। প্রসাদে কিন্তু তোমাদের আর স্বত্বস্বামীত্ব রইলোনা।"

এতক্ষণে ছাড়িয়ে নিয়েছে সে সত্যি সব পিঁপড়ে। আমরা

উল্লসিত হয়ে গিয়ে হাত পাতি ওর কাছে। ও আমাদের দেয়। নিজেও খায় আর বলে, "ত্যাখো, কি অপূর্বই না লাগে খেতে!"

সিদ্ধ বলে, "প্রসাদ কিনা, তাই আস্বাদ তার কোনোকালেই নষ্ট হয়না। শুনেছি জয়দেবের মেলার সময় কদম্বখণ্ডীর ঘাটে খিচুড়ি রেঁধে মাটির তলায় পুঁতে রেখে দেয়, আবার সে খিচুড়ি তুলে নেয় পরের বছর মেলার সময়। তখনও নাকি তা থেকে ধোঁয়া উড়তে থাকে এমনি গরম!"

ব্রহ্ম বলে, "হয়, এ সব দেবমাহাত্ম্যে অবশ্যি হয়, তোমরা বিশ্বাস করো আর নাই করো।"

ব্রহ্ম এবার দু হাত আকাশে তুলে জোর গলায় জিগির তোলে, "বলো, তারা মাঈ কি জয়!"

আমি আর সিদ্ধবাবা চুপ করে থাকি। ব্রহ্মর মুখটা কালো হয়ে ওঠে।

পাণ্ডার বাড়িতে এবার আমি একা এসেছি। সঙ্গী দু জনকে কিছুতেই সঙ্গে নিয়ে আসতে পারিনি। ওরা বলে, "খালি হাতে গিয়ে আমরা কি করবো? তুমিই বরং আমাদের কথা পাণ্ডা-ঠাকুরকে বুঝিয়ে বলো, অবশ্য যদি আমাদের খোঁজখবর করেন কিছু। তা না হলে এ প্রসঙ্গ চেপেই যেয়ো।"

বলি, "সে কি ঠিক হবে। পাণ্ডার সঙ্গে একটা গোটা দিন ধরে এত ঘনিষ্ঠতা জন্মালে আর যাবার কালে দেখা দিয়ে যাবেনা তোমরা, তাতে করে কোন ভদ্রতার পরিচয় দেওয়া হবে শুনি? যতই গরীব হোক, মানুষ মাত্রেরই তো মন বলে একটা বস্তু আছে। তা ছাড়া আমি একলা যে যাবো, যদি আমাকে না ছাড়ে, তখন কি হবে!"

বলেছিল, "আমরাইতো রইলাম এখানে বসে। বিদায় নিয়ে ফিরে আসতে তোমার আর কতক্ষণ লাগবে—বড় জোর দশমিনিট?"

আমি চুপ।

"কুড়ি মিনিট?"

তবু চুপ।

"আধ ঘণ্টা?"

"সে কি করে জানবো? দশ মিনিটের মধ্যেও ফিরতে পারি আবার দশবছরও থেকে যেতে পারি পাণ্ডার বাড়িতে।"

"সে আবার কি কথা? পাণ্ডার তো মেয়ে নেই যে ঘরজামাই করে রাখবে?"

"ঘরজামাই করে না রাখুক ডোবাজামাই করেও তো রাখতে পারে!"

"ডোবাজামাই কি?"

"শোনোনি সে জামাইকাটা হাওরের নাম? সিলেট জেলায় বড় বড় হাওরের মধ্যে তিনটি খুব বিখ্যাত—ডেকার হাওর, শনির হাওর, আর জামাইকাটা হাওর! এক জামাইকে তার শ্বশুর কেটে ঐ হাওরে পুঁতে রেখেছিল!"

"কিন্তু, তুমি তো আর পাণ্ডার জামাই নও! পাণ্ডাঠাকুরের ঐ ডোবাটাতে যদি তোমাকে পুঁতে রেখেও দেয় তাহলে সে ডোবার নাম হবে চৈতন্য ডোবা—সে তো ভালোই, তোমার নামটা থেকে যাবে জগতে!"

ব্রহ্ম সিদ্ধর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে, "এ সব অলক্ষুণে কথাও বলতে আছে!"

সিদ্ধ বলে, "এত ডর জানে থাকলে তোমরা চলবে কি করে এত বড় পৃথিবীর নানা উপলবন্ধুর পথে!"

"বক্তৃতা থামাও। তোমরাই যাওনা তাহলে! পাণ্ডার কাছ থেকে বিদায় আর সেনমশায়ের জন্য আশীর্বাদ নিয়ে এসোগে। হ্যাঁ, ভুলে যেওনা চাইতে একটু মায়ের ভোগের প্রসাদও!"

"দাও তাহলে তোমার মানিব্যাগটা। তুমি এখানে বসো ততক্ষণ।"

"এই যে দিলাম, নাও!"

কিন্তু সে নেয়না। দাঁত বের করে হাসতে থাকে। ভীষণ রাগ হয় আমার। রাগের মাথায় আমি তখন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে আসি পাণ্ডাঠাকুরের বাড়িতে। একাই ছিলাম এতক্ষণ। এইমাত্র পাণ্ডার ছেলে এসে বসল কাছে।

পাণ্ডার বাবা হুঁকো হাতে দু'বার উঁকি দিয়ে গেছেন। পিসিমাও একবার এসেছিলেন, কিন্তু কোনো কথা বলেননি। রাগ করলেন না তো!

পাণ্ডাঠাকুর আসেননি। শুধাই তাঁর ছেলেকে, "তোমার বাবা কোথায়?"

"ঘরেই আছেন। আসবেন এক্ষুনি। আপনার সঙ্গীরা কোথায়?"

এই সেরেছে রে! নিশ্চয় ওর বাবাই জানতে চেয়েছে। তিনজন না আসা পর্যন্ত ওর বাবা হয়তো বেরই হবেনা। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞেস করে আবার তাহলে কি উত্তর দিই আমি। ভাবনা শেষ না হতেই আবার প্রশ্ন—"সঙ্গীরা কোথায় আপনার?"

বলি, "আছে, কাছেই আছে ওরা। এক্ষুনি চলে যাবো কিনা আমরা তোমাদের সবাইকে ছেড়ে, তাই ওরা দেখতে গেছে আবার মায়ের মন্দির, কুণ্ড যা যা দেখবার আছে।"

এলেন পিসিমা। বললেন, "ওরা দুজন কই? চা খাবেনা?"

বলি, "চা আমি খাইনে। ওরাও খায়না।"

"তবে চারটে মুড়ি এনে দিই, একটু গুড় দিয়ে—কেমন?"

দেখি, ছেলেটি পালিয়েছে। কিন্তু পিসিমা তো চুপচাপ নেহাৎ পাহারাদারের মতো বসে থাকতে পারেনা আমার পাশে—তাই ও সব নানা কথা বলে আমার মনকে তাজা রাখছে।

সময় কেটে যায়। দশ মিনিট কি? কুড়ি মিনিটও পেরিয়ে

গেছে এতক্ষণে। শুধাই পিসিমাকে, "ঠাকুরমশায়কে একটু আসতে বলবেন ?"

"আচ্ছা!" বলে পিসিমা গেলেন আর ঢুকলেন এসে পাণ্ডার বাবা। সেই কালভৈরব মূর্তি। কখনও কোনো কথা শুনিনি এঁর মুখে। এ ঘরে ঢুকেছেন তিনি অনেকবার এর আগে, কখনও বসেননি। এবার বসলেন। আলাপ জুড়লেন, "আপনারা তো তিনজন ছিলেন। ওরা কোথায় ? চলে গিয়েছেন নাকি ?"

বলি, "না, চলে যাননি। এই একটু এদিক ওদিক ঘুরে দেখছেন। আর কবে আসা হয় না হয়, তার তো কিছু ঠিক নেই! এমন সুন্দর জায়গাটা! ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছেনা!"

আমার আর ধৈর্য থাকছেনা। কতক্ষণে বেরিয়ে পড়বো। বিদায় নেবার কালে পাণ্ডাকে কি কি বলবো সে সব কথা একবার গোছাই, আবার এলোমেলো হয়ে যায়। এ যেন দিন তারিখ ঠিক হয়ে কলকাতায় রায়টের জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে যাবার ব্যাপার অনেকটা। পড়াশুনো তৈরি যা হয়েছে তাই দিয়েই হাঙ্গাম চুকিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে। তাতে বাধা পড়তে থাকলে উৎসাহের দীপ একেবারে নিবে যায় যেন!

আধ ঘণ্টা হল প্রায়। কই, ওরা তো এলনা। মন হঠাৎ ভীষণ শঙ্কাকুল হয়ে ওঠে। ওরা কি তাহলে তারাপীঠ ছেড়ে চলে গেছে ? আমাকে রাক্ষসের দুয়োরে ঠেলে দিয়ে রাজপুত্র কোটালপুত্র বিদেয় নিয়েছে ? মনে পড়ল ছোটোবেলায় পড়া দুই ভল্লুকের গল্প :

ত্রিশ

গল্পটা আপনারা জানেন। কাজেই আর বলছিনে এখানে। তবু গল্পের শেষ কথাটা আমি মনে না করে পারছিনে—বিপদের সময় যে বন্ধু বন্ধুকে ছেড়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়, তাকে বিশ্বাস করো না!

আমি কি আমার সঙ্গীদের আর বিশ্বাস করতে পারি!

আমার অজ্ঞাতেই আমার চোখে জল এসে পড়ল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে চোখ মেলতেই দেখি দরজায় কাদের ছায়া পড়েছে!

ব্রহ্ম বলে "কাঁদছিলে নাকি?"

আমি চুপ করে থাকি।

"অভিমান করলে নাকি বিনোদিনী? কথা বলছোনা যে!"

বলি, "তোমরা এবার এখানে বসো! আমি ঘুরে দেখে আসি।"

সিদ্ধবাবা বলে, "চালাকি দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয়না। শুধু শুধু কেন বাবা আর সময় নষ্ট করবে। শিগগির চাণক্যকে ডেকে সফলটা নিয়ে নাও।"

জিভ কেটে বলি, "কি যে তুমি বলো এখনও চাণক্য আর চাণক্য! এবার দ্যাখো, চাণক্যের অভিশাপে নন্দবংশ থাকে কি যায়!"

এসে পড়েছেন পাণ্ডাঠাকুর। হাতে তাঁর একটা শালপাতার পুঁটলি। সেটা বাড়িয়ে দিলেন আমাদের দিকে। আবার ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ঢুকলেন তাঁর ঘরের ভিতর।

ভাবছি, এ আবার কি করলেন!

ফিরে এলেন সঙ্গে সঙ্গেই। পুঁটলিটাকে একটা ফরশা

ন্যাকড়ায় জড়িয়ে একটু ভদ্র করে নিয়ে এলেন। দিলেন হাতে। বললেন, "মায়ের আশীর্বাদ আর প্রসাদ। পথে খুলবেননা। বাড়িতে পৌঁছে আপনারা মা খুড়ীমাদের হাতে নিয়ে দেবেন। ওঁরা জানেন এর মর্ম। একবার কি ভেবে নিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, দুটো আলাদাই আছে ভিতরে। ছোট পুঁটলিটি সেনমশায়ের, মনে রাখবেন!"

সিদ্ধ বলে, "এর মধ্যেই সেনমশায়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে?"

আমি ভাবি, সেনমশায়ের ছোট পুঁটলি কেন হবে। সেনমশায় দিলেন টাকা ভোগের জন্য আশীর্বাদের জন্য। আমরা তো পূজো দিইনি, আর আশীর্বাদও চাইনি। বলবো নাকি কথাটা খুলে!

ভিতরের দরজায় কয়েক জোড়া তৃষিত চোখ—পাণ্ডার বাবার, ছেলের, বিধবা বোনের। তারা বুঝি দেখছে, আমরা কি রকম দক্ষিণা দিয়ে যাই!

সিদ্ধবাবা বলে, "নমস্কার ঠাকুরমশায়, চলি এবার তাহলে! আপনাকে বড় বিরক্ত করে গেলাম। অভিশাপ দেবেননা কিন্তু।"

আমার রাগ হল! সব সময় ওই ব্যাটার রসিকতা করা স্বভাব!

পাণ্ডা কিন্তু খুশিই হলেন ওর কথায়। মুখে উচ্চারণ করলেন, "তারা, তারা!" আর বলেন, "এ সব কি যে বলছেন আপনি! মায়ের আশীর্বাদ গাঁটে বেঁধে দিলাম। কোনো অসুবিধে হবেনা পথে। ভালোয় ভালোয় বাড়ি পৌঁছবেন আশা করি! জয় তারা! জয় তারা! মা, মা গো! তুই আছিস্! মা!"

পাণ্ডাঠাকুর সিদ্ধবাবার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েই আছেন। এক পা সরে আসছেননা ওর কাছ থেকে। বুঝি অপেক্ষা করছেন ওর হাত থেকে কিছু প্রণামীর। আমি সিদ্ধকে ইংরেজিতে বলছি গুটি গুটি সরে পড়ার জন্য।

ব্রহ্মচারী পাণ্ডার পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই তিনি ওর হাত

ধরে ফেলেন। কিছুতেই পা ছুঁতে দেননা। ব্রহ্ম আবার চেষ্টা করে। আবার পাণ্ডাঠাকুর লাফিয়ে লাফিয়ে পিছিয়ে যান। তাঁর হাত দুটি জোড় হয়েই আছে! বলছেন, "আমাকে প্রণাম করবেন কি, প্রণাম করে যান মাকে।"

ভিতরের দরজার দিকে তাকিয়ে আছি আমি। সেই তৃষিত চোখগুলো আরও বড় বড় হয়ে উঠছে।

আমি ইতস্ততঃ করছি। প্রণাম করতে এগিয়ে যাবো কি যাবোনা। ব্রহ্ম সরে পড়বার অপেক্ষা করছে। কেন এত দেরি করছে ব্রহ্মটা। কথায় কথায় দক্ষিণার প্রসঙ্গ উঠে পড়লেই তো বিপদ! ইশারা করছি বার বার, বুঝতে পারছেনা যেন। শেষকালে মুখ খুলে বলতেই হল—"তুমি এগোও, আমি পাণ্ডাঠাকুরের হিসেবটা মিটিয়ে দিয়ে আসি।"

ব্রহ্ম সরে পড়ল। আমি আবার একা পড়লাম। সব ভয়কে মন থেকে তাড়িয়ে দিলাম। পাণ্ডার কাছে সব খুলে বলবো। ওর যা ইচ্ছে হয় করবে।

বলি, "ঠাকুরমশায়, একটু এদিকে আসুননা!"

তিনি এলেন। আমি আমার হাতের মুঠি বদ্ধ রেখে আবার বলি, "দেখি আপনার হাতখানা একটু!"

তিনি হাত পাতলেন।

আমি আমার হাত খুললাম তাঁর হাতের মধ্যে। বললাম, "দেখবেননা। কাউকে দেখাবেনও না!"

পাণ্ডা তবু দেখলেন। বললেন, "এ আবার কি? না, না, সে হবে না।" বলতে বলতে তিনি এগিয়ে এলেন আমাকে ফিরিয়ে দেবেন বলে!

ভয়ে লজ্জায় আমার মুখ শুকিয়ে উঠল। যা ভেবেছিলাম,

তাই হল! তিনজন লোকের এক পাত করে তিন পাত ভাতের দামই তো দু টাকাতে হয়না! কিন্তু এখন আর টাকা আমি পাবো কোথায়? আমাকে তাহলে কি আটকে রাখবেন? ওরা দুজনে কি কাছেই আছে? ডাকলে শুনতে পাবে? মুখ কাঁচুমাচু করে বলি, "ঠাকুরমশায়, বড় বিপদে পড়েছি। পথে আমাদের টাকা চুরি গিয়েছে পকেট থেকে। এখন উপায় কি বলুন!"

পাণ্ডা বললেন, "বড় লজ্জা দিলেন। আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারলেননা। আমিতো ব্যবসায়ী নই। তারামায়ের সেবাইত। মায়ের নাম নিয়ে যাঁরা আসেন তাঁদের সেবা করাই আমার কাজ। সে তো আমি করতে পারিনি। কাজ না করে আমি যদি মাইনে নিই সে কি আমার অপরাধ নয়! সে কথাটাই আমি বলছিলাম—এতক্ষণ!"

টাকা দুটো ফেরত নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম—এখন আমি কি করি! এ যে আরও কঠিন পরীক্ষায় পড়লাম!

আমার কথার অপেক্ষা না করেই পাণ্ডা আবার বললেন, "আপনারা কত দূর থেকে এসেছেন! আবার ফিরে যেতে হবে। পথে পথে পয়সার দরকার। পাবেন কোথায়? আমি তো বাড়িতে বসে আছি, মায়ের কোলে বসে আছি। আমার জন্য ভাববেন না। পথখরচ আছে আপনাদের তিনজনের মতো?"

বলি, "হ্যাঁ, তা কোনোরকমে চলে যাবে!"

"কিন্তু দেখবেন, আমার কাছে যা হোক একটা বলে চলে গেলেন, পরে কিন্তু পার পাবেননা। আর আমার ত্রুটির জন্য যদি আপনারা কষ্টে পড়েন তাহলে আমিও মায়ের স্থানে টিঁকতে পারবো না! মায়ের নাম নিয়ে যাঁরা আসেন তাঁদের খুশি করতে না পারলে মা ভয়ানক রুষ্ট হন। ছেলেপিলে নিয়ে আমার এ বড় গরীবের সংসার....দেখবেন ...।"

কানে ঠেকছিল বক্তৃতার মতো। কিন্তু পাণ্ডাঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি এ যেন আরেক মানুষ—চোখ দুটো ছল্‌ছল্‌ করছে—যেন কতকালের আপনার জন তাঁর চলে যাচ্ছে তাঁর কাছ থেকে !

তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আমারও চোখ দুটো জলে ঝাপ্‌সা হয়ে এল। যে চাণক্যপ্রতিম আমাদের থলি ঝুলি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন সেই কালো কদাকার চেহারা আর দেখতে পেলামনা ! চোখ মুছতে মুছতে কল্পনা করতে লাগলাম তারামায়ের সেই অস্পষ্ট শিলামূর্তি। কাল রাত্রিবেলা যে রূপ প্রত্যক্ষ হয়নি আজ সকালে যেন সেই রূপই স্পষ্ট হতে লাগলো !

সমাপ্ত